মনের ময়ূর

মনের ময়ূর

প্রতিভা বসু

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

দিলীপকুমার রায়

অবিস্মরণীয়েষু

মনের ময়ূর

অনসূয়া

এক

আজ অনসূয়ার বিয়ে।

করোগেট টিনের দোচালা ঘরের সরু শিক-দেয়া এক হাত চওড়া দেড় হাত লম্বা খুপরি জানলার বাইরে বকুলগাছের ঝিরিঝিরি পাতায় চোখ পাঠিয়ে অপরিসর ঘরের একফালি সিমেন্ট-চটা-মেঝের উপর চুপচাপ শুয়ে কত কথা মনে পড়লো তার। এত দিন পরে, এত দুঃখ-লাঞ্ছনার অলিগলি পেরিয়ে তবে কি সত্যি-সত্যিই ভাগ্য তাকে দয়া করলো? ভাগ্য!

চোখের কোণে যেন এক ফোঁটা কৌতুক জ'মে উঠলো। আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে হাসি ফুটলো একটু, নিজের হাতের দিকে তাকালো। শাদা শাঁখা হলদে সুতোর বন্ধনে তার হাতের বন্ধনী হয়েছে আজ। ভাগ্যেরই তো প্রতীক! রক্তের মতো লাল-পাড় কোরা শাড়ির একটা অদ্ভুত গন্ধ ঘিরে আছে তাকে। বাবা কিনে এনেছেন, অধিবাসের শাড়ি। গায়ে সিল্কের ব্লাউস। এটা ওরা পাঠিয়েছে তত্ত্ব হিসেবে। তত্ত্ব হিসেবে আরো অনেক-কিছুই এসেছে সেখান থেকে। কাশ্মীরি কাজ-করা ট্রের উপর থরে-থরে সাজানো সব বহুমূল্য শাড়ি, ব্লাউস, শেমিজ, পেটিকোট, আঙুর-কাঠের নকন-খোদাই বাক্স-ভরা সুগন্ধি রুমালের রাশি, দামি সেন্ট, প্রসাধন সামগ্রী, নানা রঙের রাইটিং প্যাড, একটি সোনা-বাঁধানো

ছোট্ট মেয়ে-কলম পর্যন্ত— কলমটা অবিশ্যি কাকা তখুনি নিয়ে নিয়েছেন, তাঁর বড়ো দরকার।

আবার একটু হাসির রেখাপাত হ'লো অনসূয়ার মুখে। উঠে বসলো সে। সমস্ত শরীরে মনে কী অসম্ভব ক্লান্তি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অফুরন্ত, অনন্ত। এ কি আর কোনোদিন ফুরোবে? কখনো কি মুক্তি পাবে সে এই অপরিসীম ক্লান্তি থেকে? কাল সারা রাত একবিন্দু ঘুমুতে পারেনি, আজ থেকে জীবনের বাকি রাতগুলোতেও আর কোনোদিন তার ঘুম হবে কি না কে জানে! না কি এমন ঘুম আসবে দু'চোখ ভ'রে যে-ঘুম ভেঙে আর কখনো জেগে উঠবে না সে। আঃ! কথাটা ভাবতেও কত আরাম।

বি... হচ্ছে তার চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসে কখনো বিয়ে হয় হিন্দু-শাস্ত্রে? কিন্তু তার আবার শাস্ত্র! এমন অরক্ষণীয়া কন্যার যে-কোনো মাসের যে-কোনো তিথিতে, যে-কোনো তারিখেই বিয়ে হ'তে পারে। শাস্ত্র তো মানুষেরই সৃষ্টি। ভেঙে-গ'ড়ে সুবিধেমতো বিধান তো তাঁরাই দেবেন! চৈত্রমাসের ঝরাপাতার মতো তাকেও তাই আজ এ-সংসার থেকে ঝরিয়ে দেবার বিধান দিয়েছেন তাঁরা।

[illegible] লাগানো ঘূর্ণি গাছ থেকে গুঁড়ি-গুঁড়ি হলদে রেণু ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। জানলা দিয়ে এক ঝাপটা অনসূয়ার গায়ে এসেও লুটিয়ে পড়লো। ঘরের মেঝেটা হলদে কার্পেট হ'য়ে গেল। জোড়া তক্তাপোশের পাড়ের ঢাকনি-দেয়া বিছানাতে ঢাকাই বুটি হ'লো।

আকাশ থেকে তারারা সব খ'সে পড়লো নাকি দিনের আলোয় টি'কতে না-পেরে তাদের অন্ধকার ঘরে?

তবু তো এ-ঘরে একটা জানলা আছে পশ্চিমে, যে-জানলা দিয়ে আকাশে চোখ পাঠিয়ে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার চেষ্টা করছে অনসূয়া, যে-জানলা দিয়ে হলদে রেণুরা খুশি হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে তাদের ঘরে, তার গায়ে, তার যুগলশয্যায়। এক চিলতে রোদ এসে স্থির হ'তে পারছে তক্তাপোশের পায়ার উপর। এই ঘরে এই দুটি তক্তাপোশে তার দুই ভাইকে নিয়ে মা ঘুমোন। আর এইখানে, এখন যেখানে নতুন পাটির উপর বেলা তিনটের অসময়ে এতক্ষণ ধ'রে শুয়ে-শুয়ে আলস্যে সময় কাটাচ্ছে সে, এখানে একটা মাদুর বিছিয়ে সে নিজে শোয়। আর বাবা ঐ ঘরে। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের পাশে। সে-ঘরে জানলা নেই, আলো নেই, হাওয়া নেই। সে-ঘরে তাদের বাসন থাকে, ঘুঁটে থাকে, আবর্জনার স্তূপ থাকে সে-ঘরে।

উপায় কী! এই দুটি ঘরের দামই কুড়ি টাকা। কু-ড়ি টা-কা! ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে, মনে-মনে উচ্চারণ করলো অনসূয়া। প্রত্যেক মাসে এই কুড়িটা টাকা বাড়িওলার হাতে তুলে দিতে তার কী কষ্টই না হয়। মাঝে-মাঝে বাকি পড়ে, তখন অশান্তির শেষ থাকে না। বাড়িওলা চোখ রাঙায়। উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কেনই বা করবে না, এখন কি কুড়ি টাকায় পাওয়া যায় এ-রকম বাড়ি? অনসূয়ার করুণ মুখ আরো করুণ হ'য়ে ওঠে, হাতে-পায়ে ধরতে যেতে হয় বাড়িওলার স্ত্রীর। সে অবিশ্যি অনেক দিন চেষ্টা করেছে বাবাকে এই ঘরে, এই মেঝের উপর বিছানা ক'রে দিতে, বাবা রাজি হননি। জবাবে

কখনো-কখনো অশ্রাব্য ভাষায় খিঁচিয়ে উঠেছেন, কখনো বা বেদনায় ভেঙে পড়েছেন।

আজ এই ঘর সম্পূর্ণ তার। তার জন্য আজ যুগলশয্যা বিছানো হয়েছে ঐ তক্তাপোশের উপর নতুন তোশক-বালিশ পেতে। অসুস্থ মা ধুঁকে-ধুঁকে নিজের হাতে রচনা করেছেন আজ এই শয্যা। আর সেদিকে তাকিয়ে একটা অসহ্য যন্ত্রণার ঢেউ অনুভব করেছে সে বুকের মধ্যে। তাড়াতাড়ি দৌড়ে এই পাড়ের ঢাকনা বিছিয়ে দিয়ে সে-দৃশ্যের উপর যবনিকাপাত করেছে।

অসহ্য! অসহ্য! কত অসহ্য তা আর কাকে বোঝাবে? কে-ই বা বুঝবে! কিন্তু কেন অসহ্য? এই বিবাহ কি তাদের দিন-রাত্রির সম্মিলিত প্রার্থনারই যৌতুক নয়? তার সতেরো বছর বয়স থেকে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সবাই মিলে এ ছাড়া আর অন্য কী প্রার্থনা করেছে তার জন্যে? সে নিজেও কি কত রাতে নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে এই প্রার্থনাই করেনি? তবে আজ তার কিসের ভয়? কিসের দুঃখ? আজ, আজ তো তার পরম ভাগ্যের দিন, পরম মুহূর্ত। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সে সংসারের আর পাঁচটা মেয়ের মতো নিষ্কলঙ্ক একটি বিবাহিত মেয়ে, এক ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রী। সত্যিই কি কোনো একটি পুরুষনামধারী জীবের স্ত্রী হ'তে যাচ্ছে সে? স্ত্রী!

দুই

গরিব হোক, অন্ধ হোক, খঞ্জ, মূর্খ, কুৎসিত, নামগোত্রহীন, যেই হোক, যার সঙ্গেই হোক না, কেবল একটা বিয়ে হোক শুধু মাত্র এই চেষ্টাতেই কত গলদঘর্ম হয়েছেন অবিনাশবাবু। কাকা সাহস জুগিয়েছেন পেছনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কেউ বিয়ে করতে রাজি হয়নি তাকে। এগিয়েছে অনেকে, পেছিয়েছে শেষ পর্যন্ত সবাই। সত্যিই তো, যারা নেবে, তারা জেনে-শুনে ফুটো হাঁড়ি কিনবে কেন? ফুটোটা অবিশ্যি কাকা আগাগোড়াই গোপন করতে চেয়েছিলেন, তিনি যে তার সব চেয়ে বড়ো হিতাকাঙ্ক্ষী। পরম সুহৃদ্! কিন্তু মা রাজি হননি। ভাঙা-ভাঙা গলায় কেবলি বলেছেন, 'না না, তা হয় না, ঠাকুরপো। শেষে কি মারধোর খেয়ে মরবে মেয়েটা?'

'মরুক! মরুক! ওর মরাই উচিত।'

তবু মা জলভরা চোখে মাথা নেড়েছেন সজোরে। বাবা মাটিতে চোখ রেখে চুপ।

শেষের দিকে বাবাও সে-চেষ্টাই করেছেন, মাও সায় দিয়েছেন তাতে, কাকা ইন্ধন জুগিয়েছেন সেই সদিচ্ছায়। কিন্তু ভেঙে দিয়েছে অনসূয়া নিজে। অসম্ভব! সব গোপন ক'রে এরকম ভাবে নিজেকে গছানো, কিছুতেই, কোনো রকমেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। কত অপমান, কত অসম্মানই তো নিঃশব্দে সহ্য ক'রেছে সে, কিন্তু এটা কিছুতেই পারেনি। আর তা নিয়ে কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত নিগ্রহই ভোগ করতে হয়েছে তাদের কাছে। এমন কি দশ বছরের ছোটো বোনটাও টিটকিরি দিতে ছাড়েনি। যাকে বলতে গেলে সে-ই মানুষ করেছে মায়ের

উত্তাপ দিয়ে। 'শীতের রাত্রিতে নিজে পাৎলা শাড়ির আঁচলে গা ঢেকে যাকে জীর্ণ পুরোনো লেপ দু'ভাঁজ ক'রে জড়িয়ে দিয়েছে গরম হবার জন্য। দিক্।' এখানে অনসূয়া আপন বুদ্ধিতে অটল।

কাকা একদিন সুখবর আনলেন একটা। সব কথা জেনেও কোনো এক দয়ালু ভদ্রলোক নাকি বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন তাকে। আশ্চর্যের কথা! বাবা চকিতে চোখ তুলে তাকালেন, একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কারা?' কোনো বিষয়ে আগ্রহ দেখাবার মতো উৎসাহও আর তাঁর অবশিষ্ট ছিলো না।

ইস্তিরি-করা শার্টের কলার খুঁটতে-খুঁটতে কাকা বললেন, 'আমার এক মক্কেল।'

সাগ্রহে এগিয়ে এলেন মা। রোগে ভুগে-ভুগে তিনি ছোট্ট হ'য়ে গেছেন, দারিদ্র্যের ছাপ পড়েছে সারা শরীরে। বড়ো-বড়ো দুটি চোখের পাতা যেন সব সময়েই বুজে আসতে চায়! তবু এই একটা খবরেই তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তি উদ্দীপিত হ'য়ে উঠলো। 'কে! কে, ঠাকুরপো?'

কাকা উদাস গলায় আবার বললেন, 'আমার এক মক্কেল।'

বাবা বললেন, 'বেশ।'

'তা হ'লে আপনার অমত নেই?'

'না, অমত কিসের।'

'কথা দিতে পারি?'

'দাও।'

'ছেলেটি কী করে ঠাকুরপো?' এটা মা-র প্রশ্ন।

'কী করে?' কাকা ছোটো ক'রে হাসলেন। 'কী করে না? কলকাতা শহরের আদ্ধেক ব্যবসাই তো তার।'

'তা হ'লে খুব ধনী লোক বলো?'

'নিশ্চয়ই!'

'কী জাত?'

'জাত দিয়ে আপনার দরকার কী? আপনার মেয়ের কি কোনো জাত আছে?'

'না, না, জাত-ফাৎ আমি মানবো না, মানবো না,' চেঁচিয়ে উঠলেন বাবা। 'নিজের যার জাতের ঠিক নেই তার জন্যে আবার জাতের দোহাই! আমি তোমাকে বলছি, বিকাশ, তেলি, মুচি, হাড়ি, ডোম, শুঁড়ি, বেনে যা-ই হোক, যা-ই হোক— একটা বিয়ে ঠিক ক'রে দাও তুমি, আমি আপদ বিদেয় ক'রে বাঁচি।'

কাকা মাথা নাড়লেন। গলার আওয়াজ ঈষৎ নিচু ক'রে বললেন, 'তবে আর দেরি ক'রে লাভ কী?'

'কিছু না।'

'ওরা এ-জন্যে টাকাও দেবে কিছু, কত চাইবো বলুন তো?'

'টাকা!' কথাটা বুঝতে পারলেন না বাবা। 'টাকা দেবে কেন?'

'এই আর কি, বিয়ের খরচ-টরচ—'

'বিয়ের খরচও ওরা দেবে?'

'সব। সব। আমি বলছি কী আপনাকে।' ছুঁচলো চোখে হাসলেন কাকা।

আর অবিনাশবাবুর চোখে খুশির বদলে কেমন একটা উদ্বেগ নেমে

এলো। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপ ক'রে। বিকাশ আবার হাসলো একটু শব্দ ক'রে, 'ভয় পাবার কিছু নেই, চাপ দিলে দু'-পাঁচ হাজার টাকাও আমি বার ক'রে আনতে পারি আপনাদের জন্য।'

'দু'-পাঁ-চ হা-জা-র!' মা চোখ কপালে তুললেন, 'ওরা কারা?'

'এ-সব বিষয়ে মেয়েদের মাথা না-গলানোই ভালো। তা হ'লে আমি আজই ওদের মেয়ে দেখাতে নিয়ে আসি। কী বলেন?' কাকা বাবার দিকেই চোখ পেতে রাখলেন।

মুখ নামিয়ে নিলেন অবিনাশবাবু। 'তোমার কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি না, বিকাশ! আমার মেয়েকেই কেউ নিতে চায় না, তার উপরে অত টাকা দিয়ে—'

'আপনার বোঝা উচিত।'

'না, আমি বুঝতে পারছি না।'

'বৌদি, তুমি কি এখান থেকে একটু যাবে?'

'উনি থাকুন না, ওঁর সামনেই বলো না।' হঠাৎ যেন বাবার গলা অনেকটা মৃদু এবং অনেক বেশি দৃঢ় শোনালো।

বাবার রকম-সকম দেখে সহসা দ্বিধান্বিত হ'য়ে পড়লেন কাকা। ডান হাতের আঙুল বাঁ হাতে খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, 'এ তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এ-সব মেয়েদের জন্য কত আশ্রম, কত প্রতিষ্ঠান— আপনি তো বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন না কিছু, আর— দেখতে একটু ভালো-টালো—' কানের কাছে মুখ নিয়ে কী ফিশফিশ করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে গরম তেলে জলের ছিটে পড়লো। চিড়বিড় ক'রে উঠলেন বাবা, 'এ্যাঁ,

তুই মেয়ে বিক্রির কথা বলছিস না কি আমাকে? এঁ্যা! টাকা দিয়ে কিনে নেবে ওরা? এঁ্যা!' কাটা কইয়ের মতো ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুই না ওর কাকা! তুই না একদিন আকাশ-পাতাল ক'রে ওকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলি? সেই তুই আজ একথা বললি? সেই তুই আজ ঘরের মেয়েকে বাজারের— ছি, ছি, ছি, ছি, এ কথা বললি তুই? বলতে পারলি? এমন একটা অসৎ প্রস্তাব তুই— মুখে আনতে পারলি ওর সম্বন্ধে?'

বাবার এই অপ্রত্যাশিত উত্তেজিত ব্যবহারে কাকা চমকালেন প্রথমটায়, শেষে মুখ হাঁড়ি ক'রে বললেন, 'ওর বিয়ে এ-উপায়ে ছাড়া হবে না। কেউ নেবে না আপনার মেয়েকে।'

'না-হয় না-ই হ'লো। তবু আমি বাপ হ'য়ে এত বড়ো সর্বনাশ ওর করতে পারবো না বিকাশ!' একটু থামলেন, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'ওর অনেক ভালোই তো আমি তোর পরামর্শে এ পর্যন্ত ক'রে এসেছি, আর থাক। তুই যা, আর-কোনো হিতাকাঙ্ক্ষা করিস নে ওর জন্যে।' তারপর জোরে-জোরে উঠোনময় পাইচারি করতে লাগলেন তিনি। সারা জীবনে ভাইয়ের মুখের উপর এই প্রথম বোধ হয় এত কথা বললেন, বলতে পারলেন।

মুখ কালো ক'রে উঠে যেতে-যেতে কাকা বললেন, 'বেশ!'

তিন

তারপর সেই যে তিনি গেলেন আর এলেন না। আসলে হয়তো খুশিই হ'লেন না-আসবার এই অছিলাটুকু গ্রহণ করতে পেরে। যত কমই আসুন, তবু তো সংশ্রব থাকলে বিপদের সময় অবিনাশবাবু হাত পাততে যান তাঁরই কাছে? তা ছাড়া তিনি পাঁচটি মেয়ের বাপ, সেটাও তো দেখতে হবে? পরিবারের এত বড়ো একটা কলঙ্ক যে-মেয়ে, তার পিতামাতার সঙ্গে সংশ্রব রাখলে, বলা কি যায়, তাঁর মেয়েদের যদি তিনি যোগ্য পাত্রে বিয়ে না দিতে পারেন? কর্তব্য তো তিনি সবই করেছেন, আর কত? স্নেহান্ধ অগ্রজের অনুগত অনুজ হিসেবে শাসন করেছেন ভাইঝিকে, জাতরক্ষার অত বড়ো দায়িত্ব বীরত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন, চুলের মুঠি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনেছেন ঘরে, তবু আরো?

বেলা তিনটের পড়ন্ত রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করলো অনসূয়ার। বকুলপাতারা ঝিরঝির ক'রে কাঁপলো, তার চোখের পল্লবও কেঁপে উঠলো থরথর ক'রে। বুক-ভরা কত মেঘ, তবু জল কই এক ফোঁটা?

কাল সারা রাত ধ'রে কেঁদেছেন মা, কত কাল পরে মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে উঠেছেন, কেঁপে উঠেছেন বারে-বারে, যত নিষ্ঠুরতা করেছেন বছরের পর বছর, সব তাঁর চোখের জলের ধারা হ'য়ে গ'লে পড়েছে গাল বেয়ে। বালিশ ভিজে গেছে। কেন? দেয়ালে তাকিয়ে অস্ফুটে ঠোঁট নাড়লো অনসূয়া। এই তো মা-র আকাঙ্ক্ষিত দিন,

কত প্রার্থনার ফল তাঁর, তাঁর তেত্রিশ বছরের গালের হাড়-ওঠা মেয়ের আজ বিয়ে! তবু, তবু তাঁর কেন এই কান্না? কেন এই ত্রাস? 'কত তো বিপত্নীক আছে, কত হৃদয়বান আছে সংসারে, কেউ কি এই হতভাগিনীকে একটু জায়গা দিতে পারে না?' এ-কথা তো কত সহস্রবার উচ্চারণ করেছেন তিনি। তবে? তবে কিসের এই শোক? মাদুর পেতে চুপচাপ কত রাত পর্যন্ত বাবা বসেছিলেন বারান্দায়। তাঁর চোখেও কি কাল জল ছিলো না?

কেন? এমন সুখের দিন আর কবে এসেছে তাঁদের জীবনে? অনসূয়া— নগণ্য, অপাংক্তেয়, অনাদৃত, যাকে দেখলে আত্মীয়-পরিজন মুখ ফেরায়, বন্ধুরা হাসে, আঙুল দেখায় লোকেরা, এমন কি নিজের মা-বাপ পর্যন্ত যার মুখের দিকে তাকাতে ঘৃণা বোধ করে, সেই অনসূয়ার বিয়ে। বিয়ে!

অনসূয়ার নিজেরই কি কম আশ্চর্য লাগছে? এই যে অবেলায় ঢ'লে-পড়া রোদ্দুরে ঝিকিমিকি বকুলপাতায় চোখ রেখে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সে, লাল-পাড় শাড়ির কোরা গন্ধ ঠেলে কাঁচা হলুদের গন্ধ ভাসছে গা থেকে, লম্বা-লম্বা দুটি হাতের মণিবন্ধে চিকচিক করছে চারগাছা সোনার চুড়ি, কানের ফুটো টনটন করছে দুলের ভারে, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হ'তে পারে তার জীবনে? পাখিরা উড়লো, উড়ুক। ছেলেরা ফিরলো ধুলো পায়ে ইশকুল থেকে, ফিরুক। ঘন হ'য়ে সন্ধ্যা নামুক ঘরে-ঘরে। তবু আজ তাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না, উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হবে না, কেউ আজ ডাকবে না তাকে, কিছুতেই আজ আর তার কিছু এসে যাবে না, অথচ এ-সময় রোজ সে কী করে? স্কুল থেকেও

ফেরে না। যদি বা শনিবার ফেরে তক্ষুনি আঁচ দেয় উন্থনে, খাবার জোগাড় করে ভাইদের, অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুর মেজাজ নিয়ে কাজ থেকে ফিরে বাবার যাতে এতটুকু ত্রুটিও চোখে না পড়ে তার চেষ্টায় ব্যাকুল হ'য়ে থাকে। মা বোবা অসহায় চোখে চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন তক্তাপোশে শুয়ে, অনস্থয়া নিঃশব্দে কলের মতো সংসারের অণুকোটি দাবি মেটায়। ভাই দুটি ভালোবাসে তাকে, তারা দিদি-অন্ত প্রাণ, কিন্তু ভালোবাসা গ্রহণ করবার শক্তি কি আছে অনস্থয়ার? বোনটিকে চোদ্দ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন মা, কিন্তু বোন নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি, দিদির জন্যে তাকে কথা শুনতে হয় শাশুড়ির কাছে।

আজ সব অশান্তির অবসান। আপদ বিদায় হবে আজ। এই সংসারের সব অকল্যাণের আজ পরিমার্জনা হবে। আজ তাদের আনন্দের দিন, মুক্তির দিন, আজ অনস্থয়ার বিয়ে। কাল এই বেলা তিনটের পড়ন্ত রোদ্দুরে সে কোথায়? কত দূরে? সেই দয়ালু ভদ্রলোকটি, একটি সামান্য বিজ্ঞাপন দেখেই যিনি আজ গ্রহণ করছেন তাকে, সব জেনেও যিনি তাকে বিবাহের মর্যাদা দিচ্ছেন, কাল তিনি তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন? কত দূরে? কে! কে তিনি? দেবতা? শয়তান? কাকার মক্কেল? কে? কোথা থেকে এসে হঠাৎ ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে, কে সেই মানুষ! মা জানেন? বাবা জানেন? সে নিজে জানে? কেউ কি জানে সেই কথা? তাই কি এই কান্না? তাই? হঠাৎ অনস্থয়ার বুক বেয়ে ভয়ের শিরশিরানি নামলো। সভয়ে চোখ বুজলো সে।

চার

শোনা গেছে ভদ্রলোক বোম্বাইয়ের অধিবাসী। শোনা গেছে তিনি মস্ত ধনী। মস্ত তাঁর লোহা-লক্কড়ের কারখানা, আর সেই কারখানার একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। তাঁর ব্যবসার শাখাপ্রশাখা দেশে-বিদেশে ছড়ানো। নামতই বাঙালি, বাংলা দেশের সঙ্গে হয়তো কেবলমাত্র বিবাহ দ্বারাই আজ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে তাঁর। দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী ছিলেন, মাথার চুল পাকিয়ে ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে।

সবই শোনা গেছে, এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি কিছুই। যারা দেখতে এসেছিলো অনসূয়াকে, বিয়ে ঠিক করতে এসেছিলো পাত্রপক্ষ হ'য়ে, এ-সব তাদেরই বিবরণ। অবিশ্যি আর্থিক পরিচয় কিঞ্চিৎ দিয়েছেন ভদ্রলোক। সকালবেলাকার দৃশ্যটি মনে-মনে কল্পনা করলো অনসূয়া। তাদের বাড়িতে ঢোকবার নিচু সরু টিনের দরজাটি দিয়ে কেবল আসছেই, আসছেই। দশ-দশটা লোক ব'য়ে নিয়ে এসেছে তার অধিবাসের সামগ্রী। শুধু কি থরে-থরে প্রসাধনদ্রব্য আর শাড়ি-ব্লাউসের স্তূপ? মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, শাক-সব্‌জি, ফল-মূল, তেল-ঘি, পেস্তা-বাদাম-কিসমিস— কী না? কী তিনি পাঠাননি তাঁর রাজ-ঐশ্বর্যের স্বাক্ষরস্বরূপ? বাবা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়, মা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়, অনসূয়া দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরের দরজায়। ভাই দুটির একটি কোথায় বেরিয়েছে, আর একটি পড়া ছেড়ে উঠে এসে চুপ।

পাঁচটি ঝি, পাঁচটি ভৃত্য। প্রত্যেকে নতুন কাপড় পরেছে, নতুন জামা গায়ে দিয়েছে, মেয়েদের হাতে মোটা-মোটা সোনার বালা,

গলায় পাথরের মালা, কোমরে রুপোর গোট। পুরুষদের কোমরে রুপোর পট্টি।

ছোট্ট উঠোন ভ'রে গেল। পাঁচ মিনিট পর্যন্ত সবাই স্থির। একটু পরে সম্বিৎ পেয়ে এগিয়ে এলেন মা, শাঁখ বাজালেন দুর্বল বুকে, জিনিস-পত্র ঘরে তুললেন, খেতে দিলেন লোকজনদের, তারপর প্রত্যেককে দুটি-দুটি টাকা বকশিষ দিয়ে বিদায় দিলেন মিষ্টিমুখে। কুড়িটি টাকা বেরিয়ে গেল এক লহমায়, অনসূয়া নিশ্বাস ছাড়লো। তার আর তার বাবার কত পরিশ্রমের উপার্জন এই কুড়ি টাকা! কুড়ি টাকা তাদের বাড়িভাড়া। এই টাকার জন্য সপ্তাহে তিনটে টিউশনি করতে হয় তাকে, দশটার সময় হাতে-কাচা মোটা শাড়ি প'রে গালে পার্ল পাউডর বুলিয়ে কর্পোরেশনের স্কুলে মাস্টারি করতে যেতে হয়। আর প্রেসের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বাষট্টি বছরের বুড়ো বাপকে সকাল-সন্ধে প্রুফ দেখে-দেখে চোখ ক্ষয় করতে হয়। সেই টাকা কিনা এ-ভাবে বেরিয়ে গেল! বুকটা করকর করছিল কিন্তু মনে পড়লো চার দিন আগে ভদ্রলোক পাঁচখানা একশো টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন তার পাকা দেখার যৌতুক হিসেবে। সেই পাঁচখানার তিনখানা খরচ হ'য়ে দু'খানা এখনো তার মা-র হাতবাক্সে স্থির হ'য়ে আছে।

হাসলো অনসূয়া। কাকা হ'লে পাঁচখানা নোটে পাঁচ হাজার টাকা আদায় ক'রে ছাড়তেন, বাবা কিছু পারলেন না।

না, না, ছি! তক্ষুনি মনকে ধিক্কার দিল সে। এ সব কেন ভাবছে? কী অন্যায়! হয়তো মানুষটি সত্যিই দয়ালু। হয়তো ঈশ্বর সত্যিই এতদিনে দয়া করেছেন অনসূয়াকে, অনসূয়ার লাঞ্ছিত নিপীড়িত

মা-বাবাকে। অনসূয়াকে যাঁরা দেখতে এসেছিলেন, কই, তাঁরা তো কিছু ভয় করবার মতো নয়। তাঁদের কাছে তো ভয়ের কিছু শোনেনি। তাঁরা তো আর পাঁচ জন ভদ্রলোকের মতোই ভদ্র, বরং বেশি বিনীত, বেশি সদালাপী। দু'জন পাত্রের বন্ধু, একজন কর্মচারী।

অনেকবার ঠোঁট চেটে, অনেকবার ইতস্তত ক'রে বাবা একবার বলেছিলেন, 'ছেলেটিকে কি একবার দেখতে পারি ?'

তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন দুই বন্ধু— 'অসম্ভব।'

বাবা আর কোনো কথা বললেন না। আর সাহস নেই তাঁর। কে জানে চাপ দিলে যদি বা ভেঙে যায়।

তাঁরা বললেন, পাত্র বিয়ের দিন সময়মতো এসে পৌঁছবেন প্লেনে ক'রে, আর বিয়ে ক'রেই পরের দিন সকাল আটটায় উড়ে যাবেন অনসূয়াকে নিয়ে। সামান্য একটা বিয়ের জন্য এর বেশি সময় দেওয়া অসম্ভব তাঁর পক্ষে। বাবা বললেন, 'তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই।' হাত পেতে পাকা দেখার নোট ক'খানা কোমরে গুঁজলেন। অনসূয়া বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক চোখে। বাবা! এই কি তার বাবা ?

কিন্তু মুখ মলিন করলেন মা। রাত্তিরে খেতে ব'সে বললেন, 'আমার ভয় করছে।'

'ভয়! কেন ?'

'একবার দেখলে না, শুনলে না, খোঁজ-খবর নিলে না কিছু—'

'এর চেয়ে আবার কত ভালো ক'রে খোঁজ-খবর নেবো।' বাবা দ্রুত হাত চালালেন ভাতের থালায়।

'একটু যদি চোখের দেখাও দেখতাম মানুষটাকে—'

'যত সব—!'

'ওরা যা বললো তা যে সব সত্যি, কে জানে!'

'তবে যাও না, এরোপ্লেনে চ'ড়ে বম্বেতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো।'

পরিবেশন করতে-করতে অনসূয়া বুঝতে পারলো আস্তে-আস্তে রাগ চড়ছে বাবার। ভাই দুটি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। মা দুর্বল গলায় আবার বললেন, 'সাত দিনের মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেললো, ওদেরই বা এত গরজ কেন? আর ক'টা দিন সময় নাও তুমি, কোথায় দেশ, কোথাকার মানুষ, কী জাত—'

বোমা ফাটলো—'সময় নেবো কেন, চিরজীবন গলায় ঝুলিয়ে গুষ্টিসুদ্ধ ডুবে মরবো, না? টাকা খরচ ক'রে তো এই জন্যেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম!' ভাত ছড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মা ঢোঁক চেপে উদ্‌গত কান্নাকে বুকের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। আজকাল বাবার রাগ চণ্ডাল।

যখন রাত বাড়লো, পাড়া নিস্তব্ধ হ'লো, টিপি-টিপি পায়ে অন্ধকার রান্নাঘরে বেড়ালগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগলো নিঃশব্দে, অনসূয়া এই জানলাটি দিয়ে তাকিয়ে রইলো আকাশে। মনে-মনে বললো, একটু ঘুম দাও, ঈশ্বর! শুধু একটু ঘুম। ভুলে থাকার সামান্যতম অবকাশ। চোখের উপর হাত চাপলো জোরে।

বিন্দু-বিন্দু তারার মতো হলদে হলদে ফুল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোটি-কোটি ভগ্নাংশে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে একবার বিক্ষিপ্তভাবে কোথায় মিলিয়ে যায়— আবার রাশি-রাশি হ'য়ে ফুটে ওঠে সজোরে টিপে রাখা বোজা চোখের তলায়। তারপর আস্তে-আস্তে কখন সব পাপড়ি এক হ'য়ে একখানা ছবি তৈরি হ'য়ে গেল বিচিত্র রেখায়।

পাঁচ

নারকোল-সুপুরির বেড়া-ঘেরা একটি দোতলা বাড়ির একটি ছোটো ঘরে একটি ষোলো বছরের সুখী মেয়ে জানলায় ব'সে-ব'সে উপন্যাস পড়ছে একমনে। মাঝে-মাঝে তার চোখ পড়ছে নিচের বাঁধানো-ঘাট পুকুরে, যেখানে হিজল গাছের নিবিড় ছায়া বিছিয়ে আছে শান্তির মতো, পাশে প্রকাণ্ড পাকুড় পাতার ঝিরিঝিরি কাঁপন। মাধবীলতার বিতান-ঢাকা স্নান ক'রে উঠে কাপড় ছাড়বার ঘর। পুকুর ছাড়িয়ে, ওপারের ডাঁটাখেত ডিঙিয়ে, সীমানার দেয়াল পেরিয়ে, ধুলো-ওড়া দুপুরের তপ্ত রোদে ঝিমিয়ে পড়া পাকা শড়ক। মেয়েটির চোখ ঘুরে-ফিরে সেখানে গিয়েই স্থির হচ্ছে। সে কি জানে এই সময়ে এই রাস্তায় তাকিয়ে থাকলেই কোনো একটি প্রিয় মুখ দেখতে পাবে হঠাৎ ?

ক'দিন আগের কথা? এই তো সেদিন, সেদিনও তার ষোলো বছর বয়স ছিলো। কুসুমপুরের বাড়িতে এই তো সেদিনও সে কত সুখী ছিলো। ঘুঘু-ডাকা শাঁ-শাঁ দুপুরে বাগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াতো, পেয়ারা চিবোতো ব'সে-ব'সে, জামরুল-তলায় গিয়ে কোঁচড় ভ'রে জামরুল কুড়োতো, ঝড় উঠলে উদ্দাম আনন্দে ছোটো ভাইবোনের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ, ইচ্ছে ক'রে হেরে যাওয়া, মা-বাবার চোখ এড়িয়ে এলানো-এলানো লম্বা আমডালে উঠে ব'সে পা ঝোলানো— এই তো সব সেদিনের স্মৃতি। তারপর সন্ধেবেলা মালির সঙ্গে ঝারি নিয়ে [illegible] ; রজনীগন্ধা আর চামেলির গন্ধে ভ'রে যেতো সারা বাড়ি।

মস্ত জমি। এ-মাথা ও-মাথা হেঁটে বেড়াতেই পরিশ্রম। অবিনাশবাবু শৌখিন মানুষ আর তাঁর সুযোগ্য সহকারী, সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় অনসূয়া। আম জাম কাঁঠাল কলার বড়ো বাগান তাঁর পৈতৃক, কিন্তু শাকসবজি আর ফুল তাঁর নিজস্ব। বাপে-মেয়ে দু'জনে মিলে প্ল্যান ক'রে সাজিয়েছিলো সেই সব বাগান। টালির প্রশস্ত রান্নাঘরের পিছনে জালঘেরা প্রকাণ্ড কিচেন-গার্ডেন। বাড়ির সামনে বারান্দার তলায় কোণাচে-কোণাচে ইটের মালার ফাঁসে বিলিতি রঙিন ফুল, তাদের মাথা বারান্দা পর্যন্ত উঁচু, বারান্দার বর্ডার। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোল সবুজ লন, গোল ক'রে ঘাস-ফুল ঘিরে আছে তাদের। দু'পাশ দিয়ে সাপের মতো পেঁচিয়ে রাস্তা চ'লে গেছে সদরের ফটক পর্যন্ত। লাল রঙের সুরকি-ঢালা সেই রাস্তার দু'পাশে দুটি হাসনুহানার ঝাড়, বাঁশ দিয়ে গোল-করা মাথায় কখনো কুঞ্জলতা, কখনো ঝুমকো ফুল, কখনো মাধবী, যে-ঋতুতে যেটা হয়।

ডাইনে-বাঁয়ে একটু দূরে-দূরে ছোটো-ছোটো চৌকো-চৌকো ক'রে এক-একটি ফুলের বিছানা। পুব দিকে একেবারে কোণে একটি মস্ত বকুল ফুলের গাছ, অবিনাশবাবু বাঁধিয়ে নিয়েছেন চার পাশে, গরমের সময়ে ওখানে তিনি সবাইকে নিয়ে পাটি পেতে বসেন। তখন হাতে তাঁর একটি তালপাখা থাকে বটে, কিন্তু হাওয়ার জোরে নাড়তে হয় না সেটা।

কিচেন-গার্ডেনটি কিছু দিন পরেই অনসূয়ার মা স্বামী ও কন্যার হাত থেকে নিজের হাতেই নিয়ে নিয়েছিলেন। এবং তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে এক বছরের পরিশ্রমে তিনি এমন ফসল

ফলিয়েছিলেন যে বালিহাটির একজিবিশনে তাঁর সেই খেতের লাউ-কুমড়োই ফার্স্ট হ'য়েছিলো সেবার। অহংকারে তিন দিন তিনি চোখ টান ক'রে রইলেন।

ষোলো বছরের পলিমাটি জমেছে সেই সব দিনগুলোর উপর। তবু, তবু কি ভোলা যায়? মুছে ফেলা যায় সব হৃদয় থেকে? এই তো, চোখের তলায় সব ভিড় ক'রে এসেছে আজ। আর ঘুম নেই। ঘুমেরা দুর্বল, তারা তাদের সরিয়ে দিয়ে নেমে আসতে পারছে না চোখের পাতায়। চোখের পাতা বুজে আসছে না ভারি হ'য়ে, অতন্দ্র, নির্ঘুম জ্বালা-ভরা চোখ কেবলি খুলে-খুলে যায়।

ছয়

কুসুমপুর বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঠিক গ্রামও অবিশ্যি নয়, সাব-ডিভিশন শহর। হাই স্কুল আছে, কাছারি আছে, চারধার উঁচু রিজার্ভ ট্যাঙ্ক আছে, টিউব ওয়েল আছে, সরকারি হাসপাতালও আছে একটি, আর সেই হাসপাতাল আলো ক'রে আছেন দয়াল ডাক্তার। একশো জন রোগীর মধ্যে পঁচাত্তর জনকে তিনি অকাতরে পরপারে পাঠিয়ে দেন ব'লে বিখ্যাত। বারোয়ারি-তলায় সপ্তাহে একটি ক'রে হাট বসে, গিশগিশ করে লোক। পদ্মায় নৌকো ভাসিয়ে ব্যাপারিরা আসে দোকান করতে। মেয়েরা আসে পুতুল বেচতে, কত দূর-দূর গ্রাম থেকে কুমোররা নিয়ে আসে হাঁড়িকুড়ি। ঢাকার বাখরখানি পর্যন্ত বিক্রি হয় সেই হাটে। নদীর ধারে ফুরফুরে হাওয়ায় বাঁশ বেঁধে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখে সব শাড়ি, পূর্ব-বাংলার তাঁতিদের কীর্তি। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়নামতী, কুমিল্লা, হরিহরপুর ইত্যাদির সব বিখ্যাত শাড়ি। কালো-কালো ছিপ-নৌকোয় ভরা থাকে ঘাট, একদিন একবেলার সংসার। তারি মধ্যে ইলিশ মাছের পাৎলা ঝোল আর লাল চালের ভাত রান্না ক'রে খায় তারা, ধোয় মোছে, গুছিয়ে রাখে। কাচের চুড়ির নৌকোর কাছে রাজ্যের ছোটো মেয়েরা জটলা করে। দৈনন্দিন বাজারও আছে একটি, সেটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। হাটে বাজারে সবাই সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, সবাই সকলকে চেনে। দাদা দিদি, কাকা কাকি, জ্যাঠা জ্যাঠাইমার ছড়াছড়ি। সব পরিবার এক পরিবার, সব বাড়ি এক বাড়ি।

এদিকে রেষারেষি ঝগড়াঝাঁটির বিরাম নেই। এর কানে ওর কথা, তার কানে তার কথা লাগাবার লোকেরও অভাব নেই। হিংসে, শরিকি বিবাদ, পরচর্চা, কুৎসা, দলাদলি, সামাজিকতা লেগেই আছে। একে সুখে থাকতে দেখলে ওর বুক জ্ব'লে যায়, এই মেয়ের ভালো বিয়ে হ'লে সেই মেয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ভাব আর ঝগড়া যেন একেবারে হাত-ধরাধরি ক'রে আছে সদাসর্বদা। যেন দুই বোন। অর্থাৎ গ্রামের যা বৈশিষ্ট্য কুসুমপুর তার ব্যতিক্রম ছিলো না।

অবিনাশবাবু নেহাৎ নির্বিরোধী মানুষ। তিনি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। নালিশ, ফয়শালা, মিটমাট, কোঁদল, কানকথা— সে বরং তাঁর ভাই এলে বেশ জমে। গ্রামের আর পাঁচজন দলপতির মতো ষোলো আনির বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে ব'সে বেশ রসিয়ে-রসিয়ে ঘরের বৌ-ঝিদের নিন্দে করে, ঘোঁট পাকায়, আজকালকার ছেলেদের দাঁতে কাটে, রাজা-উজির মারে ক্ষণে-ক্ষণে। গ্রামে এই ষোলো আনির বৈঠক-খানাই সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্লাবঘর। এখানে কালেভদ্রেও অবিনাশবাবু আসেন কিনা সন্দেহ। মেয়েদের পর্দা আছে। দিনের বেলায় বেড়াতে হ'লে তাদের ঘোড়ার গাড়ি চাই, নইলে লণ্ঠন নিয়ে, চাকর নিয়ে রাত্রি-বেলা এ ওর বাড়ি সে তার বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। অবিশ্যি যার যার নিজেদের পাড়ায় চাদর গায়ে ঘোমটা টেনে বেড়াবার চলন আছে বয়স্ক মহিলাদের। নতুন বৌরা বাদ। অবিবাহিত মেয়েদের ও-সব পাট নেই।

অনসূয়ার মার এমন একটি দুরন্ত নেশা আছে যার জন্যে তাঁরও পাড়া-বেড়ানোর অবকাশ প্রায় জোটেই না বলতে গেলে। সংসারের কাজকর্মের পরে যতটুকু অবকাশ পান বই পড়েন গোগ্রাসে। গল্প, উপন্যাস,

প্রবন্ধ যা যেখানে পান। তিনটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা আসে তাঁর নামে। গ্রামের একমাত্র লাইব্রেরি কুসুমপুর ইনষ্টিট্যুটের একমাত্র মহিলা-মেম্বর তিনি। মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতা থেকেও বই আনাতে হয় তাঁর জন্য। কাজেই সময় কাটাবার জন্য কী দরকার এর ওর বাড়ি ঘুরে বেড়ানো? দু'চার জন বাছাবাছা মনের মতো বন্ধু-সমাগমে মাঝে-মাঝে ভ'রে ওঠে বাড়ি, দোতলার ঘরের সামনেকার খোলা ছাদের বাগানে আসর সরগরম হয়। অনসূয়ার মা চা তৈরি করেন, নারকোলের খাবার দেন, রুপোর পদ্মকাটা রেকাবিতে ভেজা ন্যাকড়ায় কেয়া খয়েরের পান ঢেকে রাখেন। টবের বেলফুলের গাছ থেকে বাতাসে গন্ধ ছড়ায়। সুখ ছড়ায় মনে।

অনসূয়া বড়ো হয়েছে, মাঝে-মাঝে তারও ডাক পড়ে সেই আসরে, ছোটো-ছোটো ভাই-বোনেরা ঘুরঘুর করে এ-ঘর ও-ঘর, দিদির পিঠে, মায়ের আঁচলে। ঘাগরাওলা ছোট্ট ফ্রক ফুলে ওঠে পালের মতো, ছোট্টো শার্ট ফুরফুর করে ঝাপটা হাওয়ায়। বিলিতি ম্যাগাজিনের ছবি দেখে সে-সব জামা নিজের হাতে তৈরি ক'রে দেয় অনসূয়া। শেলাইতে সে পারদর্শিনী। পাড়ায় এতদিন তার মা'রই ছিলো একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু মেয়ের কাছে এখন তিনি সহাস্যে হার মেনেছেন। ছাঁটে-কাটে অনসূয়ার মতো সত্যিই তিনি পটু নন। তিনি আসন বোনায় ওস্তাদ, লেস বোনায় অদ্বিতীয়, রুমালের কোণে সূক্ষ্ম ফুল তাঁর সত্যি ফুলের মতোই মনোরম। অনসূয়া হেসে তাঁর সঙ্গে আড়াআড়ি করে— 'তোমার ঐ আসন তো আর মানুষে গায়ে দিতে পারে না, তা যতই ভালো হোক, আর রুমালের কোণে ফুল না

তুললেই বা ক্ষতি কী।' মা চোখে চোখে হেসে বলেন, 'তা হ'লে উলের ব্লাউসটা থাক, মিছিমিছি সেটা বুনে আর লাভ কী?'

শুধু উলের ব্লাউসই নয়, লাল টুকটুকে মখমলের উপর সিল্কের স্থতোয় ফুল তুলছেন অনস্থয়ার মা, অনস্থয়ার চটি তৈরি হচ্ছে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে শেলাইয়ের চুপড়ি ঠেলে দেন, 'অত শৌখিন জুতোরই বা কী দরকার?'

'তাই তো'! অনস্থয়া দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে, কোলের উপর শুয়ে প'ড়ে মুখ ঘষে ছেলেমানুষের মতো, আর সঙ্গে-সঙ্গে ছোটো বোন বুলু এসে ঠেলতে থাকে তাকে। তারও তো জায়গা চাই মার কোলে? অনস্থয়া বলে 'দেখলে মা, কী পাজি!' বুলু একবার দিদির বুকে, একবার মায়ের কোলে হাত রেখে-রেখে আপন অধিকার সাব্যস্ত করে। ঠিক বুঝতে পারে না মা-ই দিদিকে কেড়ে নিচ্ছে, না দিদিই মাকে কেড়ে নিচ্ছে। মা আর দিদি দু'জনেই তার চাইতে এতো বড়ো যে কারো সঙ্গেই ঠিক প্রতিযোগিতা করতে পারে না, অথচ দু'জনকে ঘনিষ্ঠ দেখলেও কেমন একটা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হ'য়ে ওঠে। অনস্থয়া মাকে ছেড়ে হাসিমুখে বোনকে টেনে নেয় কোলে, 'দুষ্টুটা, পাজিটা,' ব'লে চুমু খায় গালে।

বস্তুত সব ক'টি ভাইবোনই বয়সে তার চেয়ে এত ছোটো যে দিদির চাইতে তাদের সঙ্গে ব্যবহারটা তার মায়ের মতোই বেশি। মাতৃস্নেহই সে অনুভব করে তাদের জন্য। তার যখন পুরো দশ বছর বয়স তখন তার মা দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিলেন। এখনো স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনটি। মেঘলা-মেঘলা ভোর, মা রান্নাঘরে যেতে-যেতে ফিরে গেলেন

শোবার ঘরে, বাবা বাজারে যেতে-যেতে থমকালেন, আর-একটু বেলায় একতলার পুব-খোলা বড়ো ঘরটিতে এনে শুইয়ে দেওয়া হ'লো মাকে, মা-র পিসিমা ব্যাকুল হৃদয়ে ব'সে রইলেন তাঁর মাথার কাছে। বাবা অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন এখানে-ওখানে। ডাক্তার এলো, কালো পিঁপের মতো মোটা চেহারার, সোজা ড্রেস করা, বড়ি খোঁপা, ফিতে বাঁধা জুতো পায়ে ধাত্রী এলো একজন, দাই এলো একটা, আস্তে বন্ধ হ'য়ে গেল ঘরের দরজা। আর সেই বন্ধ দরজার রন্ধ্র বেয়ে-বেয়ে মা-র সুতীব্র কান্না শেলের মতো এসে বিঁধলো অনসূয়ার বুকে। ছুটে একবার দোতলায় গেল সে, একবার সেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, একবার ধাক্কা দিলো জোরে, মুখ বার ক'রে বকুনি দিলো সেই ধাত্রী, মা-র পিসিমা এসে হাত বুলোলেন মাথায়। তারপর সেই সকাল দুপুর হ'লো, এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে চিক্কণ রোদে ভ'রে গেল দিন, আস্তে-আস্তে বিকেলের ছাই রং ছড়িয়ে পড়লো সেই রোদের মুখে, তবু বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই সেই কাতর আর্তনাদের। জামতলায় ব'সে হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে কী কান্নাই কেঁদেছিলো সে। একসময় বাবা এসে খুঁজে-খুঁজে ধ'রে নিয়ে গেলেন তাকে— 'আয়, আয়, দেখবি আয়, কী সুন্দর একটা বোন হয়েছে তোর। আর হয়েই কী বলছে জানিস? কোয়া! কোয়া! অর্থাৎ কই? কই? দিদি কই?'

বাবার হাত ধ'রে ফ্রকের ঘাগরায় চোখ মুছে ধীরে-ধীরে ঘরে এলো সে। শাদা পরিষ্কার ধবধবে বিছানায়, শাদা ফুলের মতো মিশে আছেন মা, জানলা দিয়ে আবির রং সূর্যের আভা পড়েছে তাঁর লাল সিঁথিতে, লাল-পাড় শাড়িতে, ঘরের এখানে-ওখানে, আর সেই রঙের সঙ্গে রং

মিলিয়ে পাশে ও কে? বুকের মধ্যে শিরশির ক'রে উঠলো সেই লাল টুকটুকে একরত্তি মানুষটিকে দেখে। তার নামই কি স্নেহ?

জীবন আলো ক'রে দিয়েছিলো সেই কালো-কালো চুলে ঘেরা হাসি-হাসি শিশুমুখ। তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে আরো দুটি ভাই, আরো দুটি অনুগত ভক্ত।

সাত

কিন্তু কোথায়? কোথায় গেল তারা? সেই সব সুন্দর দিনগুলো কোথায় লুকোলো তাকে ফাঁকি দিয়ে? ঘরের চারদিকে চোখ দিয়ে-দিয়ে যেন হাৎড়ালো অনসূয়া। এক মুহূর্তের জন্য থেমে রইলো মনটা, ঘড়ির কাঁটার মতো স্তব্ধ হ'লো। পরমুহূর্তেই প্রবল বেগে দুলে উঠলো আবার। কেন? কেন গেল? কার দোষে এমন হ'লো? কে মুচড়ে ভেঙে দিলো যন্ত্রের কান? কার নিষ্ঠুর হাত ছিঁড়ে দিলো সব তার? কে? কে? কে দায়ী সেজন্য? তার বাবা? তার কাকা? বন্ধু-বান্ধব? আত্মীয়-পরিজন? না, না, কেউ না, কেউ না! কাউকে অভিযোগ করতে পারে না সে। দোষ তার একলার, তার একলার দোষেই অমন সুন্দর একটা পরিবার একেবারে মুছে গেল, ধুয়ে গেল, বিধবার সিঁথির মতো ধু ধু শাদা হ'য়ে গেল জন্মের মতো। কেন এত বড়ো একটা ভুল সে করেছিলো জীবনে? এই কালি কেন লেপন করেছিলো নিজের মুখে, সকলের মুখে, তার জন্য সমস্ত গ্রাম, সমস্ত সমাজ পর্যন্ত কলঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছিল সে-সময়ে। এই যে কলকাতা শহর, সর্বজাতি সর্বভাব সমন্বয়ের নিবাসস্থল, এখানে, এই শহরেও কি এ-রকম ঘটনা অবিরল? অনিন্দ্য? আর ওখানে, ঐ কুসুমপুরের মতো একটা ছোটো এঁদো গ্রামে, মফস্বল শহরের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে অবিনাশবাবুর মতো ওরকম একজন সচ্চরিত্র সজ্জন ব্রাহ্মণের কন্যা হ'য়ে সে কিনা—ছিঃ!

ঠিক। ঠিক হয়েছে। যোগ্য সাজাই হয়েছে তার। এই মেয়ের এই গতি ছাড়া আর কী হবে? সংসারে যা উচিত তা-ই তো হয়!

তা-ই হয় না? হঠাৎ জুড়োনো আগুনে ফুলকি উঠলো। দাঁতে দাঁত চাপলো জোরে। চকমকির আগুনে যেমন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে তেমনি জ্ব'লে উঠলো বুক। আমি! আমি! আমি দোষী? আমার দোষ? না! না! না! কক্ষনো না, কক্ষনো না!

নিজের সঙ্গে নিজেই কোমর বেঁধে ঝগড়ায় দাঁড়ালো অনসূয়া। সে কি জানে না তার এই দুর্বিষহ যন্ত্রণার জন্য সত্যিই কে দায়ী। খুব জানে, খুব ভালো ক'রে জানে! সর্বান্তঃকরণে জানে।

হয়তো ভুল হয়েছিলো তার, সমাজের কাছে, গুরুজনের কাছে হয়তো অন্যায়ই করেছিলো সে, হয়তো সেই ভুলের জন্য কোনোদিন এর চেয়েও বেশি কষ্ট পেতে হ'তো; তা না-হয় হ'তোই, কিন্তু আর তো কেউ দায়ী হ'তো না সেজন্য? অভিযোগ করার তো থাকতো না কেউ? কিন্তু কাকা? তার কাকা নামধারী সেই নিষ্ঠুর, কপট, হৃদয়হীন মানুষটা, যার নাম শুনলে সে শিহরিত হয়, যাকে দেখলে আজ পর্যন্ত তার মাথায় খুন চেপে যায়, সেই লোকটা, সেই লোকটা কেন তার শুভাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে মহাসমারোহে এত বড়ো একটা উপকার করতে গিয়েছিলো? কেন গিয়েছিলো? কে বলেছিলো? কে চেয়েছিলো তার সেই দয়া? দাক্ষিণ্য? বাবা বলেছিলেন? মা বলেছিলেন? তার হৃদয়-জোড়া ভালোবাসা তাকে প্রবৃত্ত করেছিলো? কে? কেউ না। তবু সে গিয়েছিলো, দিনের পর দিন ছিপ ফেলে ফাত্‌না পেতে বঁরশিতে টোপ গেঁথে বসেছিলো মাছের আশায়। যদি সেদিন সেই উপকারটি না করতেন ভদ্রলোক, তা হ'লে আজ অনসূয়া— আজ অনসূয়া কী! হঠাৎ কী মনে ক'রে তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে এলো।

অথচ কী আশ্চর্য, তারপরেই তাঁর সব কর্তব্য ফুরিয়ে গেল একদমে। অন্যায়ে যিনি এত বড়ো দণ্ডধারী দুঃখের দিনে আর তাঁর পাত্তা মিললো না। ষোলো বছর ধ'রে সে যে-আগুনে জ্বললো, পুড়লো, যে-গ্লানি, যে-লজ্জা, যে-দুঃখ সে নিঃশব্দে বহন করলো তিলে-তিলে, তাতে তিনি শুধু ইন্ধনই জোগালেন, উৎসাহ-ভরে ধিক্কার দিয়ে-দিয়ে সে-আগুনকে তীব্রতরই করলেন, নির্বাপণের এতটুকু চেষ্টাও ছিলো না তাঁর মধ্যে।

অনসূয়া কি ভুলে গেছে সেই সব দিন? সেই সব কথা? সে কি ভোলবার? না কি অনসূয়া ক্ষমাই করেছে তাকে? তুষের আগুন কি ধিকিধিকি অবিরতই জ্বলছে না এই বুকের মধ্যে ষোলো বছর ধ'রে? আজ এখন এই মুহূর্তেও কি অনুভব করছে না সেই আগুন? হাতের নরম মুঠি শক্ত হ'লো, তেত্রিশ বছরের দুঃখবেদনাবিদ্ধ কঠিন মুখ কঠিনতর হ'লো।

আট

কুসুমপুর হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার অবিনাশবাবু। সেখানে সস্তা চাল, জমিজোড়া বাগানে প্রচুর ফল, গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ। দুঃখের কথা ওঠে কিসে? আর নারকোল সুপুরি তো অপর্যাপ্ত। তাল আর খেজুরের রস কে খায়? ধনী না হ'লেও সচ্ছলতার এক তিল অভাব ছিলো না। শ্রী ছিলো, লক্ষ্মী ছিলো। সংসার উপচে পড়তো আনন্দে। সেকালের এফ.এ. পাশ তিনি, বিদ্যানুরাগী মানুষ, পড়াশুনো করতে ভালোবাসেন, ভালো পড়ান, বি.টি. পাশ হেডমাস্টার তাঁর পরামর্শ ছাড়া এক পা নড়েন না। স্কুলে সুনাম কত, কত নাম-ডাক। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। লোকেরা সম্মান করে, ভালো [illegible], ছাত্ররা পড়তে চায় তাঁর কাছে, ভালো ইংরিজি জানেন ব'লে অন্যান্য মাস্টারদের চাইতে মাইনেও কিছু বেশি তাঁর। আর সেই মাইনে তাঁদের ছোটো পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট।

কেনো বই, আনো শাড়ি, দাও ভোজ, কারো জন্মদিনে উপলক্ষ্যে আনো উপহার কলকাতা থেকে— একেবারে জমজমাট ব্যাপার। খাওয়া-পরার মতো আনন্দের খোরাকও জোগায় সেই টাকা।

অনসূয়া লেখাপড়ায় মেধাবী, দেখতে ভালো, আশে-পাশের সকলের চাইতে স্বতন্ত্র মেয়ে। বাবার গৌরবের বিষয়। তাঁর সব সন্তানের মধ্যে সব চাইতে আদরের এই প্রিয়তম কন্যা। ঐ গ্রাম্য শহরে অবিনাশবাবুর কন্যা দস্তুরমতো বিখ্যাত। সব-কিছু মিলিয়ে সেই শহরে সত্যিই তো একটু বিশেষ ছিলো সে।

গ্রামে মেয়েদের হাই স্কুল ছিলো না, জমিদারের বৃত্তিতে প্রাইমারি স্কুল চলতো একটি। এ নিয়ে মাথাব্যথাও ছিলো না কারো। চিঠি লিখতে শিখতে পারাই মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট বিদ্যা। আর কী দরকার? জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে? ওকালতি করবে? না, কী? পনেরো বছর বয়স হ'লেই তো বাপ-মার চোখের নিদ্রা হরণ হয়— বিয়ের চিন্তায়। তবে আবার হাই স্কুলে যাবে কখন। কিন্তু অবিনাশবাবু মুস্কিলে পড়লেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনের তাগিদটা তাঁর নিজেরই থাকার দরুন স্কুল-কমিটিতে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। কো-এডুকেশনে দোষ কী? যতদিন মেয়েদের জন্য আলাদা হাই স্কুল না হচ্ছে ততদিন মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গেই স্কুলে বসুক না। ঘরে-ঘরে টিটকিরির ধুম প'ড়ে গেল। অবিনাশবাবু বিচলিত হ'লেন না। এ নিয়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম করলেন, আলাদা কমিটি গঠন করলেন, গেলেন এস.ডি.ও-র বাংলোয়, গেলেন জমিদারের দপ্তরে, সব ব্যবস্থা ক'রে নিজের মেয়েকেই প্রথম নিয়ে গেলেন স্কুলে, ক্লাশে, অনসূয়া তখন পনেরো পূর্ণ হ'য়ে ষোলো ধরো-ধরো।

তারপর এই নিয়ে কী দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি, মাথা-ফাটাফাটি! কত কাণ্ডই না হ'লো সেই বছর। মাঝখান থেকে নির্বিরোধী মানুষটির একটি শত্রুপক্ষ সৃষ্টি হ'লো শুধু, আর কোনো লাভ হ'লো না। মা বললেন, 'বিশ্রী শহর সত্যি, এখানে আবার কেউ কারো জন্য ভালো করে?'

'প্রথম-প্রথম সব জায়গাতেই এই হয়, তাই ব'লে কি হাল ছেড়ে দিলে চলে?' মাথা নাড়লেন বাবা— 'আর কো-এডুকেশনটা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বোধ হয় না-হওয়াই ভালো। এবার একটা

মেয়েদের হাই স্কুলের জন্যই চেষ্টা করবো আমি।' নিজের আদর্শে অটল তিনি।

'তার চেয়ে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করো, কাজ হবে।'

'বিয়ে! এখুনি?'

'এখুনি মানে? বয়স কম হ'লো নাকি।'

'তুমি থামো। ঐটুকু মেয়ের কাছে আর বিয়ে-বিয়ে কোরো না।'

'শীতলবাবুর মেয়ে ওর চেয়ে এক বছরের ছোটো, তারও তো বিয়ে হ'য়ে গেল। দক্ষিণের বাড়ির নাটুর বিয়ে হ'লো, সুজিতের বোনের—'

'উঃ, কার সঙ্গে কার তুলনা!' বাবা প্রায় কঁকিয়ে উঠলেন।

'এত বাড়াবাড়ি কোরো না, মেয়ে তোমার দেখতে যেমনই হোক, টাকা এত প্রচুর নেই যে—'

'দয়া ক'রে তুমি একটু চুপ করো। ওর জন্যে একটু কম ভাবো তুমি—' বিনীত অনুরোধে একেবারে আভূমি আনত হন বাবা, মা হেসে ফেলেন আর কথার গুরুত্ব নষ্ট হ'য়ে যায়।

তখনকার দিনে সেই গ্রামে পনেরো-ষোলো বছর বয়স নেহাৎ কম বয়েস ব'লে গণ্য ছিলো না, অনসূয়ার চেয়ে কত সব ছোটো-ছোটো মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল চোখের সামনে অথচ রূপে গুণে শতগুণ শ্রেষ্ঠ হ'য়েও অনসূয়া কুমারী। একটু তো লজ্জাও আছে? মনে-মনে খানিকটা পরাজয়ের মতোও লাগে বৈকি। কাজেই মা-র সেই ইচ্ছেটা অপরাধের ছিলো না। তাছাড়া সে-সময়ে বড়ো-বড়ো ঘর থেকে অনেক ভালো-ভালো বিয়ের প্রস্তাবও এসেছে তার। মেয়েই তো! একদিন তো দিতেই হবে পরের ঘরে, ভালো ঘর ভালো বর পেলে তো দিয়ে

দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এটাও একটা যুক্তি ছিলো মা-র। 'আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাট্রিকটা দিক তো।' স্ত্রীর সেই অমোঘ যুক্তি থেকে উদ্ধার পাবার এই শেষ অস্ত্রটি ব্যবহার করেছেন অবিনাশবাবু।

অনসূয়াকে নিয়ে বাবার এই বাড়াবাড়িটা অবিশ্যি কোনোদিনই পছন্দ করেননি কাকা, কিন্তু কী যে পছন্দ করেছেন তারও কোনো নির্দিষ্ট চেহারা ছিলো না। মাঝে-মাঝে অনসূয়ার মনে হ'তো কাকা যেন ভালো চোখে দেখছেন না তাকে। পড়াশুনোয় তার এই অসাধারণত্ব, তার বাবার এই যত্ন, এ-সব যেন পছন্দ হচ্ছে না তাঁর, অথচ খুব ভালো কোনো সম্বন্ধ এলেও তেমন উৎসাহিত হ'তে দেখা যেতো না তাঁকে। তবে তিনি কী চাইতেন ?

অনসূয়ার চাইতে তিন বছরের ছোটো তাঁর নিজের মেয়েটি, কলকাতার স্কুলে পড়তো। বয়সেই অনসূয়ার তিন বছরের ছোটো, কিন্তু পড়াশুনোয় তার ছ'বছর তলায় ছিলো। স্বাস্থ্যহীন নীরক্ত কালো রং পাৎলা চুল এইটুকু ছোট্ট একটি মেয়ে। কাকা কি তার গ্রাম্য ভাইঝির সঙ্গে নিজের শহুরে মেয়েটিকে তুলনা ক'রে ঈর্ষায় কাতর হতেন ? মনে-মনে তখন ভেবেছে অনসূয়া। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রায়ই এই কথা ভাবিয়েছে তাকে। কিন্তু লজ্জিতও হয়েছে সেজন্য, নিজেকে সে ছোটো মনে করেছে, দাম্ভিক মনে করেছে, গুরুজনের প্রতি এই মানসিক অসম্মান অন্যায় মনে হয়েছে তার।

নয়

কাকা ওকালতি করতেন কলকাতায়। সেখানেই তাঁর বসবাস ছিলো। ওখানকার ইট-কাঠে হাঁপ ধরলে কিম্বা প্রসবান্তে স্ত্রীর শরীর খারাপ হ'লে এখানে চ'লে আসতেন চেঞ্জে। কেননা দেশটাই ছিলো তাঁর একচেটে বায়ু-পরিবর্তন-কেন্দ্র। সমুদ্রের কাছে এই গ্রাম, পুকুরের টাটকা মাছ এ-বাড়িতে, বাড়ির গোরুর সদ্য-দোয়ানো দুধ, চাল আর মুসুরির ডাল তো এখানকার একটা বিশেষ আকর্ষণ। আর সব চাইতে যেটা আরামদায়ক সেটা হচ্ছে বৌদির অক্লান্ত পরিচর্যা। যে-মুহূর্তে যেটা চাই তাই নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন তিনি। যে-মুহূর্তে যেটা ইচ্ছে সেটাই তিনি পূরণ ক'রে চলেছেন অবিরাম। কাজের তাড়ায় নিজে হয়তো বেশি দিন সেই আরাম উপভোগ করতে পারতেন না, কিন্তু স্ত্রী এবং পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়েকে রেখে দিয়ে পুষিয়ে নিতেন সেটা।

ভাইয়ের প্রতি অবিনাশবাবুর কেমন একটা অস্বাভাবিক দুর্বলতা ছিলো। তিনি যে কী খুশিই হতেন ওঁরা এলে! তবে কাকা কেন তাঁর দাদাকে সেটুকু আনন্দ জুগিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন না? উপরন্তু এ-বাড়ির একজন অংশীদারও তো তিনি? না-এলে না-গেলে কেমন ক'রে চলে? যদিও তাঁদের এই পৈতৃক বাড়ির বারো-আনি অংশই অবিনাশবাবুর নিজের তৈরি। আগে কী ছিলো? ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল, আর জঙ্গলের মধ্যে এই পাকা বাড়িটির একটি ভগ্নাবশেষ। অবিনাশবাবু প্রথম জীবনে অনেক দিন পর্যন্ত বিদেশেই কাজ করতেন। মা-বাপ ছিলো না, স্ত্রী আর ভাইকে নিয়েই তাঁর সংসার। বিকাশকে কলকাতায়

বোর্ডিঙে রেখে পড়াতেন। সে ছুটিতে-ছুটিতে আসতো, স্বামী-স্ত্রীর নির্জন সংসার মুখর হ'য়ে উঠতো। বি.এ. পাশ ক'রে ল পাশ করলো বিকাশ, বহু অর্থ ব্যয় ক'রে ওকালতিতে বসলো কলকাতা শহরে, বিয়ে ক'রে প্রচুর টাকা আদায় করলো শ্বশুরের কাছ থেকে, যদিও এ-বিষয়ে অত্যন্ত লজ্জা ছিলো অবিনাশবাবুর। ভদ্রলোকের মেয়েটিকেই তো আনছি, তার উপর আবার টাকা? বিকাশ বললো, 'ও-সব যুক্তির কোনো মানে নেই। টাকা না-নিয়ে আমি এক পা এগুবো না। আমার কি দর নেই?' অবিনাশবাবু চুপ হ'লেন। অবিশ্যি ভাই তাঁর অকৃতজ্ঞ নয়, সেই টাকার ছোট্ট একটি কণা নিজের বিয়ের খরচ বাবদ সে দিলো তার দাদার হাতে, কিছু টাকা ধার শোধেও খরচ করলো। তখন অনসূয়া সবে জন্মেছে। আর অনসূয়া যখন তিন বছরের তখন দেশে এসে স্থায়ী হ'লেন অবিনাশবাবু।

বিয়ে করেছিলেন অত্যন্ত অল্প বয়সে। করেছিলেন মানে, বিধবা রুগ্ন মা-র পরিচর্যার জন্য করতেই হয়েছিলো। বিকাশ তখন দশ বছরের বালক আর অবিনাশবাবু উনিশ। মাঝখানে আরো চারটি ভাইবোন হারিয়েছিলেন তিনি, তারপর এই বিকাশ। শোকে দুঃখে অকাল-বার্ধক্যে মা-র ক্ষীণায়ু ক্ষীণতর হ'তে-হ'তে একদিন আস্তে নির্বাপিত হ'য়ে গেল, বিকাশকে পিতৃস্নেহে লালন করতে লাগলেন তিনি। আর তার শিক্ষার জন্যই, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই চাকরি নিতে হ'লো বিদেশে। অনসূয়া যখন জন্মালো অবিনাশবাবু তখন তিনের ঘর ধ'রে ফেলেছেন। এই কণিকাটুকু যে স্বর্গের সুষমা নিয়ে একদিন আসবে তাঁদের ঘরে, এমন একটা স্বপ্নও যখন আর তাঁরা দেখেন না, ঠিক তখন একমাথা চুল আর

গোলাপি রং নিয়ে যেন হঠাৎ একদিন অনসূয়া আবির্ভূত হ'লো তাঁদের সংসারে। বয়স্ক পিতা-মাতার দুর্বার স্নেহ উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। কৃষির দপ্তরে টুরের চাকরি করতেন, ভালো উপার্জন ছিলো, বড়ো দরের উন্নতি ছিলো সেই চাকরিতে, কিন্তু হঠাৎ মত বদ্‌লে গেল তাঁর। চাকরির আর কতটুকু মূল্য? কত সুখ দিতে পারে টাকা? মেয়েকে একদিনও না-দেখে থাকাটা তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি ব'লে মনে হ'তে লাগলো। সে-ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র এ চাকরিতে কেন, পৃথিবীর কোনো-কিছুতেই আর সম্ভব নয়। প্রস্তাবটা অনসূয়ার মা-ই তুললেন প্রথমে, 'চলো না, আমরা দেশে গিয়েই থাকি। তোমার এই রোজ-রোজ টুরের চাকরি আমারও আজকাল আর ভালো লাগে না।'

না-লাগার অবিশ্যি সংগত কারণ ছিলো একটি। মেয়ে জন্মাবার আগে তিনি নিজেও যেতেন সঙ্গে, ঘুরে বেড়াতেন নদীর বুকে-বুকে, কিন্তু মেয়ে বুকে ক'রে আর সেটা সুবিধে হ'লো না। ঘোরাঘুরি করলে কিছু-না-কিছু অনিয়ম হবেই শিশুর। সেটা অসম্ভব। চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হ'য়ে যে-মেয়ের চব্বিশ বছর বয়সে সন্তান জন্মায় সেই মা-র পক্ষে তার শিশু যে কতখানি, সে-কথা শুধু সেই মায়েরাই জানেন। জীবন থেকে আরো অনেক-কিছুর মতো এই স্বামীসঙ্গটুকুও তাঁকে বাদ দিতে হচ্ছিলো।

দেশের জমিজমা তো বারো ভূতেই লুটে খায়, (যদিও কথাটা সত্য নয়, কেননা পরে জানা গেল বছরে দু'একবার কাকা আসতেনই দেশে, যা পারিতেন যতটুকু পারতেন গাছের আম জাম কাঁঠাল কলা সবই তিনি নিয়ে যেতেন তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে, নারকোল বিক্রি করতেন, জমি

ইজারা দিতেন) —নিজেরা গিয়ে থাকলে তেমন যত্ন নিলে ঐ থেকেই মোটামুটি খাওয়া-পরার সংস্থানটা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়ই। কী দুঃখে আর পরের চাকরি করা! কথাটা মনে ধরলো অবিনাশবাবুর। কিন্তু চাকরি তো একটা চাই-ই ? ঐটুকু জমিদারির উপর ভরসা করলে আর ক'দিন ? বাড়ি-ঘর সংস্কার করতে হবে, মেয়েকে বড়ো করতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে— ভেবে-চিন্তে ওখানকার স্কুলে একটা চিঠি লিখলেন তিনি। ঐ স্কুল থেকেই একদিন সসম্মানে সারা গ্রামের মুখ উজ্জ্বল ক'রে এণ্ট্র্যাস্ পাশ করেছিলেন। অল্প চেষ্টাতেই, প্রায় বিনা চেষ্টাতেই, একটা মাস্টারি জুটে গেল তাঁর।

তারপর কাটা হ'লো জঙ্গল, বাড়ি সংস্কার করা হ'লো, রান্নার দালানের সব ইট কবে একবার এসে বিক্রি ক'রে গিয়েছিলেন কাকা শ' হিসেবে, জানতেন না অবিনাশবাবু। ইট কিনে সেই ঘর আবার তোলা হ'লো মাথায় টালি দিয়ে। জানলা-দরজা তাও শোনা গেল তিনিই বিক্রি ক'রে গেছেন মাস কয়েক আগে। অবিনাশবাবু বললেন, নিজেরা চুরি ক'রে বিকাশের নামে চালাচ্ছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ লাগাবার চেষ্টা। বিকাশ শুনে রাগে লাল হ'লো চিঠিতে। মেয়ে হ'য়ে দাদা-বৌদি যে বদলেছেন একটু, সেটুকুও আভাসে-ইঙ্গিতে বাতাসের মতো ছড়িয়ে দিলো সেই সব জ্বালা-ভরা অক্ষরের সারিতে। আর চিঠি প'ড়ে একটু হেসে সস্নেহে অবিনাশবাবু বললেন, 'পাগলা!'

তারপর বসাও দরজা, লাগাও জানলা, আনো সিমেণ্ট, বাড়াও বাড়ি, কমাও ছাত, তিন বছরের যত্নে অক্লান্ত পরিশ্রমে চাকুরি-জীবনের সব সঞ্চয় খসিয়ে তবে তৈরি হ'লো এই সুন্দর বাগানওলা দোতলা

ভদ্রাসনটি। নতুন ক'রে পুকুর কাটিয়ে মাছ ছাড়া হ'লো, মাটি তোলানো হ'লো পুরোনো গাছের গোড়ায়, নতুন গাছ লাগানো হ'লো উৎসব ক'রে, ছাঁটা হ'লো অকেজো ডাল, বোজানো হ'লো খানা-খন্দ, কৃষি-বিভাগের সমস্ত বিদ্যে তিনি ফলালেন এই জমিতে। তারপর একদিন সতেজ সবুজ পাতারা ডাল-পালা মেলে বিস্তীর্ণ হ'লো আকাশে। প্রচুর ফল-ফুল প্রসব ক'রে শিগগিরই অবিনাশবাবুর যোগ্যতাকে অভিনন্দন জানালো।

পাঠাবার মতো সব ভাগই অবিশ্যি ভাইয়ের কাছে পাঠাতেন তিনি সমান অংশে, কিন্তু বাড়ির আদ্ধেক তো আর পাঠানো সম্ভব নয়। সেটাতে ভোগ-দখলের স্বত্ব রাখতে হ'লে আসতে হয়, থাকতে হয়। আজ এই বয়সে এই অভিজ্ঞতায় কাকাকে ভালো ভাবেই বিশ্লেষণ করতে পারে অনসূয়া, তখন সেই বয়সে শুধু একটা অনির্দিষ্ট খারাপ লাগার রেশ জড়িয়ে থাকতো মনে-মনে। একটা অসন্তুষ্টির কামড়। বাবা-মা'র এত প্রিয়পাত্র কাকাকে পছন্দ করতো না সে। ভালোবাসতো না।

বাবা না-হয় ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ ছিলেন, কিন্তু মা? মা-ও কি কিছু বুঝতেন না। মা তো পরের মেয়ে, মা-র সঙ্গে তো কাকার রক্তের সম্বন্ধ ছিলো না? তিনি তো নিরপেক্ষ হ'য়েই বিচার করতে পারতেন মানুষটাকে। তবে? তবে কেন নিজের অনলস স্বভাবের সমস্ত পরিশ্রম তিনি অম্লানবদনে খরচ করতেন এই লোকটির উপর? এর কোনো জবাব খুঁজে পেলো না অনসূয়া। ভাবতে গিয়ে মনে-মনে রাগ হ'লো।

অবিশ্যি কাকাও প্রতিদান দিতেন বৈকি। লাল-পাড় ধনেখালির

শাড়ি আনতেন অনসূয়ার মা-র জন্য, বিস্কুটের টিনে ভ'রে মিঠে পান আনতেন ভিজে ন্যাকড়ায় বেঁধে, বাবার জন্যে আনতেন বাদলরামের সুগন্ধি কিমাম। ছেলেমেয়ের জন্যে আনতেন কত রকম দম-দেয়া খেলনা, লাল পিছলে-কাগজ মোড়া খয়েরি চকোলেট, ফ্রক, সস্তা দামের লাল ডুরে শাড়ি— যখন আসতেন বাড়িতে দস্তুরমতো সাড়া প'ড়ে যেতো একটা। তারপর যাবার আগে ধার চাইতেন বাবার কাছে, 'একদম ফুরিয়ে গেল, কেমন ক'রে যে গেল—'

'তাতে কী, তাতে কী,' ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন বাবা, 'আমার কাছে তো রয়েইছে, এই তো মাইনে পেলাম।'

কাকার যাবার সময়টা ঠিক ঐ মাইনে পাওয়ার সময়টাতেই পড়তো কিনা।

'হ্যাঁ, আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব, ওরাও তো রইলো, খরচ তো আছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে আর ভাবতে হবে না তোকে।'

ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক বুদ্ধিতে কাকা অদ্বিতীয়। তাঁর জিনিসপত্রগুলো জেগে থাকতো সকলের চোখের সামনে, তাঁর দেবার হাতের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তো পাড়ায়, আর তার দাম জোগাতে মাসের শেষে মাথা চুলকোতে হ'তো বাবার। তারপর সেই যে কাকা যেতেন আর চার মাসের মধ্যেও তার খোঁজ থাকতো না।

কিন্তু কাকিমাকে ভালোবাসতো অনসূয়া। কাকিমা'র সব-কিছুই তার ভালো লাগতো। রোগা-রোগা হাতে হঠাৎ-হঠাৎ কাকিমা গলা জড়িয়ে ধরতেন তার, আদর করতেন, টানা-টানা বিষণ্ণ চোখে হাসি-হাসি

মুখে মিষ্টি গলায় ডাকতেন 'অনাই, অনিমণি!' অনসূয়া একেবারে গ'লে যেতো কাকিমার সরু উষ্ণ রোগা বুকের মধ্যে।

এখনো, আজও কাকিমা তার তেমনি ভালো আছেন, তেমনি ছোটো-খাটো সরল স্নেহে-ভরা মানুষটি, স্বামীর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। ঐ একটি মাত্র মানুষ, যিনি তাকে কোনোদিন দুঃখ দেননি, অসম্মান করেননি, এক দিনের জন্যে সায় দেননি স্বামী-ভাসুরের হৃদয়হীনতায়। একটা কটু কথা উচ্চারণ করেননি আজ পর্যন্ত। বার-করা-মেয়ে যখন ঘরে এলো, অনসূয়ার মা পর্যন্ত ক'দিন ছোঁননি তাকে— কাকিমা জড়িয়ে ধরলেন দুই হাতে। তাঁর চোখ বেয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়লো। কী ক'রে বুঝলেন তিনি সেই দুঃখ? কোনোদিন তিনিও কি এই দুঃখের আস্বাদ জেনেছিলেন জীবনে? না কি শুষ্ক স্বার্থপরায়ণ স্বামীর ঘর করতে-করতে একটা রন্ধ্র খুঁজছিলেন নিজের ব্যর্থতাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দেবার। বুকের ভেতর থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো অনসূয়ার। কণ্ঠার উঁচু হাড় আর-একটু উঁচু হ'য়ে উঠলো। সরু একছড়া হার চিকচিক করলো সেই হাড়ের উপর।

·

দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ির ভাঁজের মতো তার মনের অবচেতন থেকে আর-একটি পরত উঠে এলো উপর তলায়। আরো একজন মানুষকে তার মনে পড়লো, ঝাপসা, অস্পষ্ট। কিন্তু এইমাত্রই কি মনে পড়লো? অভিনয়ের নেপথ্যসংগীতের মতো আজ ক'দিন ধ'রেই সেই অস্পষ্ট ঝাপসা মানুষটি কি তার হৃদয়কে মথিত ক'রে রাখেনি? সেই, সেই মানুষটা! আজ ষোলো বছর পরেও যার শত্রুতা ফুরোলো

না তার সঙ্গে। সেই জন্তু, সেই পশু, সেই মনুষ্যনামধারী বর্বর জানোয়ারটা।

অথচ কী আশ্চর্য! একদিন সেই মানুষটাকেই নাকি সব চেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলো সে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন তার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত হ'য়ে উঠেছিলো ভরা জোয়ারের মতো। ঘন চুলে আঙুল ডুবিয়ে সে যখন আস্তে-আস্তে কথা বলতো, মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো অনসূয়া, বুদ্ধির আভায় উজ্জ্বল ঝকঝকে দুটি চোখের তারায় কত স্বপ্নই সে দেখতে পেতো। বিনম্র মধুর একটি সুন্দর মুখ। অতি সুন্দর। মুখটা এখন আর মনে পড়ে না, মানুষটিকেই আর মনে পড়ে না। বরং মনে পড়লে রাগে চিড়বিড় ক'রে ওঠে সর্বশরীর। তবু, তবু মনে পড়া চাই? আশ্চর্য! আশ্চর্য! অল্প বয়সের একটা বোকা মেয়েকে ঠকাতে একটু আঘাতও লাগলো না ওর পৌরুষে?

জেল? ফাটক? সশ্রম কারাদণ্ড? মাত্র তিন বছরের? তিন বছরের ফাটক-বাস আবার একটা শাস্তি! সারা জীবন ও কেন প'চে-প'চে মরলো না ঐ চারটে বোবা দেয়ালের ফোকরে বন্দী হ'য়ে। সমগ্র জীবন তো তার দিলো ব্যর্থ ক'রে? সমস্ত-কিছু থেকে বঞ্চিত করলো তো তাকে? আর নিজে? কোথায়? কোন নরকে পচছে এখন? কোন নরক থেকে স্মৃতি হ'য়ে আজ আবার ধোঁয়ার মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে এলো তার মনে? তার আজকের এই শুভদিনে, শুভক্ষণে। স্মৃতি! স্মৃতি! স্মৃতি! দম-আটকানো, অন্ধকার, কালো-কালো গহ্বরের সারি সব। অনসূয়া কি উন্মাদ হ'য়ে যাবে এই স্মৃতির ভারে? অনসূয়া কি এই মুহূর্তে এই লাল-পাড় অধিবাসের কোরা শাড়ি প'রে,

হাতে চিকচিকে সোনার চুড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে এখান থেকে? যাবে সেখানে, সেই নরকে, যেখানে ব'সে-ব'সে আজকের দিনেও লোকটা শত্রুতা করছে তার সঙ্গে, স্মৃতির সমুদ্র সাঁৎরে-সাঁৎরে ঠিক এসে হাজির হয়েছে এই অন্ধকার টিনের ঘরে।

'বিনয়! আমাকে তুমি বাঁচাও। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে মুক্তি দাও এই যন্ত্রণাময় স্মৃতি থেকে। তুমি তো আর নেই, তুমি অস্পষ্ট, তুমি নিশ্চিহ্ন, তুমি তো শুধু একটা ইতিহাস মাত্র। তোমার চেহারা ভুলে গেছি আমি, তোমাকে ভুলে গেছি, তুমি যাও, তুমি যাও, আর আমাকে কষ্ট দিয়ো না। দিয়ো না।' হাতে হাত নিষ্পেষিত করলো অনসূয়া, হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজলো।

দশ

বিনয়! বিনয়! বিনয়! সারা মন জুড়ে এই এক ধ্বনি, সারা বাড়ি জুড়ে এই এক শব্দ। বাবা বলেন, 'চমৎকার।' মা বলেন, 'সত্যি!' ছোটো ভাই-বোনেরা মূর্ছা যায় বিনয়দা'র নামে। আর অনসূয়া চৌধুরী? কুসুমপুরের শ্রেষ্ঠ মেয়ে? বিনয় রায়ের শান্ত স্নিগ্ধ সুশীলা মেধাবী ছাত্রীটি? নত মস্তকে বইয়ের বোঝা নিয়ে যে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া শেখে আর চোখে চোখ পড়লে দৃষ্টি নামায়— সে? জঘন্য! প্রেম ব'লে আবার আছে নাকি কিছু? কাকা ঠিকই বলেন, 'প্রেম করে কারা? দেহ বেচে যারা।' এই মর্মে তিনি একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন সেই সময়ে। কিন্তু বক্তৃতায় কি কোনো কাজ হয়েছিলো? যাতে হয়েছিলো সে হচ্ছে চাবুক। চাবুক— চাবুক ছাড়া কি এর আর অন্য ওষুধ আছে?

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় গুনে-গুনে কাকা নিজের হাতে চাবুক মেরেছিলেন, আর বাবা, তার সব চেয়ে বড়ো বন্ধু, বড়ো সুহৃৎ, ভাইয়ের প্ররোচনায় রক্তচক্ষে বলেছিলেন, 'বল, বল হতভাগিনী, কী সাক্ষী দিবি তুই, কোর্টে দাঁড়িয়ে তুই কী বলবি?'

পাগলের মতো দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন মা, 'বল, ওরে বল, বল যে ওঁরা যা বলছেন তুইও তা-ই বলবি, নয়তো আমি রক্ষা করতে পারবো না তোকে, এঁরা মেরে ফেললেও আমি শব্দ করতে পারবো না।' আর সতেরো বছরের কচি কলাপাতার মতো নরম, মধুর মেয়ে অনসূয়া তার জলে-ভরা ভাসা-ভাসা দুটি চোখ মেলে চুপ ক'রে তাকিয়ে ছিলো

শাদা দেয়ালের দিকে। প্রাণ বেরিয়ে গেলেও সে কি পারে বিনয়কে কোনো অমঙ্গলে ঠেলতে?

ন্যাকা! শেষ পর্যন্ত তো বাপু হার মেনেছিলি সেই চাবুকের কাছে? তারপর তো কেমন সুন্দর গড়গড় ক'রে কাকার শেখানো বুলি আউড়ে গেলি কোর্টে দাঁড়িয়ে?

সত্যি, কেমন সুন্দর গুছিয়ে বলেছিলো কথাগুলো। —পুকুরে বিকেল-বেলা গা ধুতে গিয়ে দেখে বিনয় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই বলে, 'একবার আমাদের বাড়ি যাবে?'

অনসূয়া বললো, 'কেন?'

'দিদি পিঠে করেছেন, তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।'

'মা'কে বলি।'

'বলবার আর দরকার কী, এই তো বাড়ি, যাবে আর আসবে।'

এই ব'লে সে অনসূয়াকে তার দিদির বাড়িতে নিয়ে যায়, বাড়িতে কেউ ছিলো না সে-সময়ে, অনসূয়াকে সে তার নিজের ঘরে বসিয়ে বলে, 'দিদি এখুনি আসবেন, ততক্ষণ তুমি এই মজার জিনিসটা ছাখো, শুঁকে ছাখো!' —কৌতূহলী হ'য়ে একটা লাল রঙের আরকের শিশি ওর হাত থেকে নিজের হাতে নেয় অনসূয়া, তারপর নাকের কাছে ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে।

এই সময় বিচারক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি গেলে কেন?'

অমনি সে নিজের বুদ্ধিতে জবাব দিলো, 'এইটুকু বয়স থেকে চিনি, দাদা ব'লে ডাকি, কী ক'রে জানবো—'

'যখন দেখলে ওর দিদি বাড়ি নেই তখন ওর ঘরে ঢুকলে কেন?'

'ঢুকেছিলাম না-জেনে, তারপরে ও বললো যে দিদি নেই।'

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে বিনয়— দুটি অপলক চোখ তার অনসূয়ার বিশ্বাসঘাতক মুখের উপর একাগ্র। দুটি বলিষ্ঠ হাত পরস্পর-নিবদ্ধ অবস্থায় বুকের উপর জড়ো ক'রে রাখা। বিচারক বললেন, 'ঠিক?' গম্ভীর গলা জবাব দিলো, 'ঠিক।' 'তুমি তাকে অজ্ঞান করেছিলে?' 'আমি তাঁকে অজ্ঞান ক'রেই বার ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

তারপর? তারপর আর কী, মেয়ে ভুলোবার যোগ্য শাস্তি! তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। দিদির টাকার জোরে বেঁচে গেলো, নইলে যাবজ্জীবন পচতো না ও সেখানে?

কেঁদেছিলো অনসূয়া। বাবা আর উকিল-কাকার সঙ্গে জানলাবন্ধ ঘোড়ার গাড়ি চ'ড়ে বাড়ি আসতে-আসতে কেঁদেছিলো। বাড়ি এসে মা-র বুকে মুখ রেখে কেঁদেছিলো, বাবার কুঞ্চিত চোখকে অগ্রাহ্য ক'রেও কেঁদেছিলো। কাকার কদর্য গালাগালি, প্রতিবেশীদের ভিড়, ছোটো-ছোটো ভাই-বোনের বিস্ফারিত দৃষ্টি— কিছুই তখন তাকে বিরত করতে পারেনি সেই কান্না থেকে। তার লজ্জা ছিলো না, ভয় ছিলো না, একটা সুতীব্র ব্যথার হাহাকার ছাড়া আর-কিছুই ছিলো না তার বুকের মধ্যে। তারপর কত বিনিদ্র রাত, কত দুঃসহ দিন কেটে গেল সেই একই বুক-ভাঙা অবিরাম, অবিশ্রাম, একটানা কান্নার স্রোতে। আর তার অনেক, অনেক দিন পরে একদিন কখন নিজেরই অজান্তে নিজে-নিজেই শান্ত হ'য়ে গেল সে, সেই সুন্দর সুকুমার নিরপরাধ একখানা অতি প্রিয় মুখের উপর কখন আবরণ পড়লো

একটি। অনসূয়া ভুলে গেল তাকে, ভুলতেই হ'লো, ভোলবার জন্য উপড়ে ফেলে দিতে হ'লো তার রক্তকণিকা, যে-কণিকা সবে আকৃতি ধরেছিলো অনসূয়ার জঠরে।

আট মাসে বিনয়ের সঙ্গে আঠারোটা শহর ঘুরেছিলো সে। চব্বিশ বছরের যুবক আর সতেরো বছরের তরুণী, ভয়ে সেই অপরিণত ভীরু হৃদয় কত যে কেঁপেছিলো। কত ত্রাস, কত অনাহার, কত অনিদ্রা, হিসেব আছে কোনো? গোরুর গাড়িতেই হয়তো কাটলো তিন দিন, সাত দিন শুধু ট্যাক্সিতেই ঘুরেছিলো। কত রাত নৌকোতে— রাস্তায়, ঘাটে, রেলে, ষ্টিমারে, কোথাও কি শাস্তি আছে? কোনো জায়গায় গিয়ে একসঙ্গে দশ দিনও টিঁকতে পারেনি ভয়ে। যদি ধ'রে ফেলে, যদি টের পেয়ে যায় কেউ? যদি আলাদা হ'তে হয় জীবনে, তা হ'লে তারা বাঁচবে কেমন ক'রে? পৃথিবীর সমস্ত এক দিকে, আর তাদের যুগল-জীবন এক দিকে। মনে-মনে তারা কী প্রার্থনা করেছে? ঈশ্বরের কাছে কী চেয়েছে ব্যাকুল হৃদয়ে? শুধু দু'জনে আমরণ একসঙ্গে থাকার এতটুকু প্রতিশ্রুতি।

হায় রে! মূঢ়মতি বালিকা! বত্রিশ বছরের প্রায় প্রৌঢ় মহিলা সতেরো বছরের যুবতীকে স্মরণ ক'রে হাসলো মনে-মনে। কত আবেগই ছিলো সেই অল্পবয়সী বোকা হৃদয়ে, কত কষ্টই না পেয়েছে তা নিয়ে। বাজে! বাজে! বাজে! সব বাজে! কী হ'লো তারপর? ম'রে গেল? গলায় দড়ি দিলো, আগুন জ্বালালো কাপড়ে? কী! কী করলো সেই মেয়ে? কী করতে পারলো?

ভালোই করেছিলেন কাকা! মিছিমিছিই সে কাকাকে দোষ দেয়। উনি যদি সারা দেশ মন্থন ক'রে, ডিটেকটিভ লাগিয়ে, বাবার অর্থ অকাতরে ব্যয় ক'রে তখন তাকে ফিরিয়ে না আনতেন তা হ'লে কী-ই না হ'তে পারতো তার! কাগজে-কাগজে যদি তার হরণ মামলার কাহিনী বড়ো অক্ষরে ছাপা না হ'তো তা হ'লে এত দিনে তার কী গতি হ'তো? কোন নরকে প'ড়ে থাকতো কে জানে? কাকাকে ধন্যবাদ দিতে হয় বৈকি।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো অনসূয়া, রক্ত জ'মে গেল।

সত্যি! এমন শুভাকাঙ্ক্ষী তার বাবাও ছিলেন না। তিনি তো বলেইছিলেন, 'শাসন না-মেনে, সমাজ না-মেনে, মা-বাপের কথা না-ভেবে মেয়ে যখন বেরিয়েই গেল ঘর থেকে, ব্রাহ্মণের মেয়ে হ'য়ে শূদ্র-সন্তানকেই যখন পছন্দ হ'লো তার, তখন সে যাক। মরুক সে। নিজের কপাল নিজেই পোড়াক। মিছিমিছি লোক-জানাজানি ক'রে মান খোয়ানো কেন?' কিন্তু কাকা চরিত্রবান লোক, তিনি কি দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারেন? পাপীকে সাজা না দিলে যে পাপ তাঁরই হবে। তাই তো কত কষ্ট স্বীকার ক'রেও ভাইঝিকে আবার ফিরিয়ে আনলেন ঘরে, মামলা ক'রে শাস্তি দিলেন সেই কুচরিত্র পাপিষ্ঠকে। তা নইলে কে জানে, সেই পাপিষ্ঠ হয়তো এতদিনে কত অমঙ্গলের বীজ ছড়িয়ে বেড়াতো সারা পৃথিবীতে। ভালোবাসার ভান ক'রে আরো কত মেয়েকে ঘরের বার করতো। ভালোমানুষদের টেঁকাই দায় হ'তো সংসারে।

কেমন ছিলো সেই পাপিষ্ঠটা? কেমন ছিলো? মনের আনাচ-কানাচ আজ হাৎড়ালো অনস্থয়া। মনে পড়ে না। সব মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে মন থেকে। কেবল স্মৃতি! স্মৃতির ভার! স্মৃতি তো কিছুতেই মোছে না, কেন মোছে না? কী নিষ্ঠুর স্মৃতি! কেন এমন ভার হ'য়ে চেপে থাকে বুকের উপর।

বাইরের রোদ আস্তে-আস্তে মৃদু হ'য়ে মৃদুতর হ'লো, তারপর নিবে গেল ঘর থেকে। অস্থির অনস্থয়া একবার তাকালো বেলার দিকে, তাকালো নিজের দিকে, তাকালো আশে-পাশে। কেমন একটা অজানা আতঙ্কে দুরদুর করতে লাগলো বুকের ভেতরটা। ঘরের মধ্যে কত বার কত জন এলো, কত জন গেল, মা এসে যে কী বললেন, কী করলেন, ঘরের দরজায় উঁকি মেরে মাথা নেড়ে কী জিগেস করলেন বাবা, কিছুই যেন ভালো বুঝতে পারলো না সে। জোড়া তক্তাপোশের যুগলশয্যায় চোখ রাখলো খানিকক্ষণের জন্য, আর তার তলায় সূর্যাস্তের লাল আভা ছড়ানো, আবির রঙের টিশু-শাড়ির আগুন ঝিলিক দিলো, সাচ্চা জরির জ্যোতিতে চোখ ঠিকরে গেল তার।

আর কতক্ষণ পরেই দেখা হবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে, যিনি দয়ার অবতার, যিনি সব জেনেও বিয়ে করছেন এই বত্রিশ বছর বয়সের আধবুড়ো মেয়েকে, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন এই আগুন-লাগা টিশু-শাড়ি, যাঁর পুরো নামও এখন পর্যন্ত জানে না তারা। তিনিই আজ তার স্বামী হবেন। স্বামী! চমৎকার। অনস্থয়া উঠে দাঁড়ালো।

এগারো

বেলা চারটে বাজতেই শালকের টিনের ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছে, আর-একটু পরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে সেই অন্ধকার। রাজ্যের পাখি এসে হাট জমাবে বকুলগাছের ডালে-ডালে, তাদের কিচিরমিচির থামতে-থামতে রাত আসবে এই বাড়িতে। পাশের ঘরে কম্পোজিটর নিকুঞ্জ সরকার ফিরে আসবে কাশতে-কাশতে বাঁকা হ'য়ে, বাবরিছাঁটা শশিশেখর আসবে শিষ দিতে দিতে, ননির মা হাত-মুখ মুছে, চুল বেঁধে, পান খেয়ে, টিপ-কপালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে গিয়ে গলির মোড়ে—কেন দাঁড়ায়? ননির বাবা নিরুদ্দেশ, তার আশায়?

ষোলো বছর আগে টিঁকতে না-পেরে গ্রাম থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে একদিন অবিনাশবাবু ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে উঠেছিলেন, ভাই তাঁকে এই আশ্রয়ে রেখে গেছেন। তাঁর তিনতলার ফ্ল্যাটের চারখানা ঘরে তাঁরই তো থাকা দায়, এতগুলো লোক ধরবে কোথায়? এই দুঃখেই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি তুলে নিলেন জমি কিনে। জল-ভরা চোখে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বাবা বললেন, 'ওকে যদি যেতে দিতাম ওর অদৃষ্ট নিয়ে, হয়তো ও সুখীই হ'তো। আমাকেও আজ এমন ক'রে ভিটেমাটি-ছাড়া, গাঁ-ছাড়া হ'য়ে পথের ভিখিরি হ'তে হ'তো না এত বড়ো কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে।' মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কাকা ফোঁশ ক'রে উঠলেন, 'এ-রকম অন্যায় ক'রে যদি সুখীই হয়, তবে তো সে-সুখ ভেঙে দেওয়াই গুরুজনের কর্তব্য।'

'হয়তো—'

'হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। গোড়া থেকেই আমি জানতাম মেয়েকে আপনারা যে-রকম প্রশ্রয় দিচ্ছেন তার একটা যোগ্য শাস্তি পেতেই হবে আপনাদের।'

'পেলাম।'

'আমি গিয়ে না-পড়লে আপনাদের অদৃষ্টে আরো দুঃখ ছিলো। বামুন-শূদ্রে একটা বিয়ে হ'তেই বা বাধা ছিলো কী? মেয়ের স্নেহে আপনারা যে-রকম অন্ধ!'

'এর চেয়ে আর একটু ভালো বাড়ি পাওয়া যায় না, বিকাশ? অন্তত একটু ভদ্র?' বাবা হতাশ চোখে চার পাশে তাকালেন। মা ব'সে পড়েছেন দরজায়, চৌকাঠের উপর মাথায় হাত দিয়ে। ভাই-বোনেরা শ্যাওলা-ধরা তিন হাত চওড়া তিন হাত লম্বা উঠোনের কোণে এর মধ্যেই দুটো নন্দদুলাল আর একটা তুলসী চারার সন্ধান পেয়ে কে কোন গাছের অধিকারী হবে তা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। কাকা চোখ কপালে তুললেন, 'এ-বাড়ি আপনাদের পছন্দ হয় না? কুড়ি টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো বাড়ি আমি ছাড়া আর-কেউ বার করতে পারবে কলকাতায়?' মা-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন বৌঠান, একটা কথা আপনাদের বলি, পাপীকে যারা প্রশ্রয় দেয়, পাপ তাদেরও কম নয়। সমস্ত জীবন ও জলুক পুড়ুক, পুড়ে-পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক, তবেই ও বুঝবে কত বড়ো অপরাধ ও করেছিলো। আর সেই আগুনের তাপ তার বাপ-মার গায়ে তো একটু লাগবেই।' মা বড়ো-বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন কাকার মুখের দিকে। কাকা আবার আঙুল নাড়লেন, 'বুঝুক, ফলটা বুঝুক ও!'

কী বুঝলাম? পশ্চিমের জানলা দিয়ে নিবে-আসা সূর্যের লাল নরম মুখের দিকে প্রশ্নটি যেন নিক্ষেপ করলো অনসূয়া। একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটলো মুখে।

মিস্টার রায়

এক

ভোর হ'লো। নিটোল একটি সোনালি সকাল। সমুদ্র থেকে নির্যাস টেনে ঠাণ্ডা বাতাস ছড়িয়ে পড়লো মিস্টার রায়ের রঙিন বাগানে, ঘরে, দরজায়, জানলার পর্দায়। সবুজ ঘাসে হোস-পাইপ দিয়ে জল ছিটোনো হ'লো, আর মাটির বুক থেকে বেরিয়ে এলো কচি দূর্বার আদিম গন্ধ। সাতটি রঙ খেলা করলো সমুদ্রের বুকে, তারপর দপ ক'রে প্রকাণ্ড হীরের বল উঠে এলো ভেতর থেকে। পুবের জানলা দিয়ে মিঠে রোদ এসে আদর করলো মিস্টার রায়ের পাৎলা তামাটে চুলে। গোলাপি রঙের ছিটে লাগলো আলমারির আয়নায়, ড্রেসিং টেবিলে, নতুন ঝকঝকে বার্নিশ-গন্ধ ঘরের মেঝেতে, কাশ্মীরি গালিচার লাল গোলাপে।

সারারাত জেগে থেকে এই তো একটু ঘুমিয়েছেন, একটু তন্দ্রা, এর মধ্যেই সকাল হ'য়ে গেল। পায়ের উপরকার সিল্কের বেডকভারটা ঠেলে আড়মোড়া ভাঙলেন তিনি। মাথার কাছে কোজি-ঢাকা চায়ের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করলেন একটু, তারপর পায়ে পা ঘ'ষে আবার চোখ বুজলেন। একটু আরাম। কতকাল পরে এই আরাম তাঁর। ভোর না-হ'তেই লাফিয়ে উঠতে অভ্যস্ত তিনি। এক চুমুক চা খান কি খান না, তক্ষুনি তোয়ালে নিয়ে ছোটেন স্নান করতে। স্নানের আগে দশ মিনিট একসারসাইজ। স্নান ক'রে বেরুতে-না-বেরুতেই পোশাক নিয়ে প্রস্তুত

হ'য়ে-থাকা বেয়ারা ছুটে আসে কাছে— পাঁচ মিনিট। তারপর ব্রেকফাস্ট। প্রকাণ্ড ডাইনিং-টেবিল বুকে নিয়ে প্রশস্ত খাবার ঘর তেমনি সুসজ্জিত হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তিনি শোবার ঘরেই সেরে নেন সেটা। তারপরই কারখানায় ছোটেন, ছ'টার মধ্যে হাজির সেখানে। ছ'টা থেকে একটা পর্যন্ত মাথা তোলেন না, তারপর এক ঘণ্টার জন্যে লাঞ্চের ছুটি। পিলপিল ক'রে প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে স্রোতের মতো মানুষ বেরুতে থাকে, তিনি তাঁর অফিসঘরের জানলা দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেন। তিনি বেরোন কালে-ভদ্রে এক আধ দিন। ভালো লাগে না; কী হবে এটুকু সময়ের জন্যে আর বাড়ি গিয়ে। বাড়িতে তাঁর কিসের প্রত্যাশা? কে তাঁর জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে আছে সেখানে? ফেরেন একেবারে সেই রাত ন'টায়। একেবারে সব সেরে, সব মিটিয়ে, হিসেব-কেতাব ঘেঁটে।

সেই দৈনন্দিন নিয়মে আজ বাধা পড়লো তাঁর। সারা শরীরে আলস্য মাখিয়ে এপাশ-ওপাশ করলেন অনেকক্ষণ, তারপর বেলা আরো একটু চড়লে উঠে এলেন দক্ষিণের পোর্টিকোতে। এক ঝাপটা হাওয়া উঠে এলো সোজা সমুদ্র থেকে, সিল্কের ড্রেসিং-গাউনে দোলা লাগলো। আঙুলে বিলি কাটার মতো নড়তে লাগলো নেটের পর্দার ঝালর। শাদা দুধের মতো মারবেলের মসৃণ মেঝেতে লম্বা ছায়া পড়লো। কত শখ ক'রে তৈরি করিয়েছেন এই অর্ধচন্দ্র, শেকলে ঝোলানো বারান্দা— কত খরচ ক'রে মারবেল আনিয়েছেন জয়পুর থেকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই বারান্দায় কবে তিনি আর এমন নিশ্চিন্ত মনে এসে দাঁড়িয়েছেন এর আগে। কই, মনে তো পড়ে না। হঠাৎ যেন মনে হ'লো এ-বারান্দাকে তিনি আজই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করলেন, আজই মাত্র

বুঝতে পারলেন এ-বারান্দা তাঁর কত সুন্দর। সমস্তটা আকাশ এখানে কৃতজ্ঞতার মতো লুটিয়ে পড়েছে। আকাশের নীল ছায়া তার তুলো-পেঁজা মেঘ নিয়ে ছড়িয়ে আছে সমুদ্রের বুকে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি এখানে দাঁড়িয়ে। নিচে অজস্র লাল নীলের উপর চিকচিক করছে রোদ, কালো হলদে প্রজাপতিরা ঝলসে বেড়াচ্ছে পাখা মেলে-মেলে, বড়ো-বড়ো গাছের মাথায় বাতাসের আদর।

আলস্য। আলস্য। আলস্য আজ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে, চোখ যেন জড়িয়ে আসছে কেবল। কেন? কাল ঘুমুতে পারেননি ব'লে? তাই কি তাঁর এই ক্লান্তি? এই মধুর ক্লান্তি, যে-ক্লান্তিকে তিনি কবে বিদায় দিয়েছিলেন শরীর থেকে তা পর্যন্ত ভুলে গেছেন? ক্লান্তি? হাসলেন একটু, একটা সিগারেট ধরালেন পেট্রল-চকমকিতে। তাঁর আবার ক্লান্তি। গদি-আঁটা মখমলের কোমল ডিভানে গা এলালেন, পা থেকে শাদা বাছুর-চামড়ার নরম চটিটি আস্তে খ'সে পড়লো ধবধবে মেঝেতে, একেবারে মিশে গেল। ভেতরে ঘরদোর আয়নার মতো ঝকঝকে করছে ভৃত্যেরা, মুচছে জানলার কাচ, ঝাড়ছে আলমারি, শানপালিশ করা মেঝে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ক'রে তুলছে ধুয়ে-মুছে। এ-ই নিয়ম। বেলা আর-একটু বাড়লে, হাওয়া আর-একটু গরম হ'লে খসখস ফেলে দেবে ঘরে-ঘরে, তারপর সুগন্ধি জলে স্প্রে করা হবে তার উপর। চন্দনের গন্ধে আকুল হ'য়ে উঠবে সারা বাড়ি, হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়বে শীতলতা। কিন্তু কার জন্য? তাঁর জন্যই। যদি বা তিনি কখনো, কোনো মুহূর্তে, খেয়ালবশত কারখানা থেকে চ'লে আসেন বাড়িতে? বাঁকা হাসলেন আবার।

দৃঢ় একটি হাত মাথার তলায় রেখে আরেকটি হাতের দুটি মোটা আঙুলের ফাঁকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি অকারণে জ্বলতে দিয়ে তারপর চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন আকাশের উজ্জ্বল নীলে। জীবনের অপরাহ্ণে দাঁড়িয়ে তাঁর স্মৃতি-সমুদ্রও আজ উদ্বেল, অধীর। চল্লিশ বছর বয়সের এই লক্ষপতি ব্যবসায়ী, জীবনযুদ্ধে যিনি সর্বতোভাবে জয়ী, নিরপেক্ষ, আত্ম-নির্ভরশীল, তিনিও আজ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির হ'য়ে পড়লেন।

এই বুড়ো বয়সে তাঁরও আজ বিয়ে? আশ্চর্য! তাঁরও তবে বিয়ে? তাঁরও একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের উপর আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই যবনিকাপাত!

এক ঝাঁক সিন্ধু-পাখি উড়ে গেল ছায়া ফেলে-ফেলে, একভাবে এক লয়ে, ঝুমরা তালে। সমুদ্রে প্রবল শব্দে ঢেউ ভাঙলো একটি। একটার পর একটা তরঙ্গ একই ছন্দে একই গতিতে গড়িয়ে আসতে-আসতে তীরের কাছে আড়মোড়া ভাঙলো বোধ হয়। নাচের বিরতি। দূরে কোথায় কার গাড়ির সুরেলা হর্ন সোহিনীর পর্দা ছুঁয়ে গেল, তারপর চুপ। মস্ত বাড়ি। রূপকথার রুপোর কাঠির স্পর্শ লাগলো। নিঝুম। নিথর। কেবল মাথার উপর বিরাট পাখার শাদা-শাদা চারটি ব্লেডের ভ্রমরগুঞ্জন। তানপুরোর চারটি তার। জোয়ারিতে ভরা। 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক', 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু', 'জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না'— আর? আর কী? আর কী না গাইতো সে?

কী? কী? হঠাৎ মনে পড়াবার ব্যাকুলতায় অধীর হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার রায়। কত স্বর ভেসে-ভেসে এলো, কথা মনে পড়লো না। কিছুতেই না। কাব্যলক্ষ্মী ধরা দিলেন না তাঁকে। কী আর হবে। সিগারেটে শেষ টান দিতে-দিতে সহাস্যে মাথা নাড়লেন। সরস্বতী তো মেয়ে। আর কত আশা করা যায় তাঁর কাছে? তা নইলে প্রাক্তন বন্ধু হিসেবে মিস্টার রায়ের সঙ্গে তাঁর এর চাইতে ভালো ব্যবহার করা উচিত ছিলো আজ। না কি সওদাগরি করেন ব'লেই এই অভিমান? একটা সামান্য গানের কলিও ধরিয়ে দিতে পারেন না মনে?

এক সময়ে তো কত প্রণয় ছিলো। পরীক্ষার খাতায় যে-সব উঁচু মগজের ক্যারদানি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মাস্টার মশাইদের, সে-সব তো তাঁরই প্রণয়ের ফল। তা নইলে বিনয় রায় আবার পড়াশুনো করতো কবে? বীরের মতো হলে ঢুকে যে তীরের মতো বেরিয়ে আসতো, তার জন্য নিজে কতটুকু খাটতো সে?

স্মরণশক্তি— অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিলো তাঁর। বাজি রেখে সময় নির্দিষ্ট ক'রে কবিতা মুখস্থ করতেন তিনি। মাত্র দু'বার প'ড়েই রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' প্রায় কণ্ঠস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো। আর আজ কিনা একটা সামান্য গানের লাইন মনে আনতেই গলদঘর্ম?

কিন্তু তাঁকে মনে আনতে আরেকজন গলদঘর্ম হবেন না তো আজ রাত্তিরে? হঠাৎ কথাটা মনে হ'য়ে ছেলেমানুষের মতো লাল হ'য়ে উঠলেন। একটু যেন কাঁপলো বুকটা। নিজের চব্বিশ বছর বয়সের সুখের প্রাবল্যে ভরা উদ্দাম সবুজ দিনগুলোর দিকে একবার ফিরে তাকালেন তিনি।

দুই

এম.এ. পরীক্ষা হ'য়ে গেল। দিদি বললেন, 'এবার তোকে বিলেত পাঠাবো।' বিনয় বললো, 'সেখানে গিয়ে কী এমন দিগ্‌গজ হবো?'

'সকলে যেমন হয়।'

'মিছিমিছি টাকা খরচ।'

'টাকা তো খরচের জন্যেই।'

'তা খরচ তো অনেক করলে, এবার একটু আয়ের চেষ্টা করলে মন্দ কী।'

'নিশ্চয়ই মন্দ নয়। আমিও তো তার জন্যেই তৈরি হ'তে বলছি।'

'যা তৈরি হয়েছি তাতেই আমাদের বেশ চলবে। একটা যে ফার্স্ট ক্লাশ পাবোই তা তুমি ধ'রে নিতে পারো, আর একটা যে মাস্টারি জুটবেই তাও প্রায় নিশ্চিত।'

'তার চেয়ে বেশি জুটলে মন্দ কী?'

'না-জুটলেই বা এমন কী ক্ষতি?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ কর তুই। নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম কর তো ক'দিন, তারপর সব হবে। আমিও তদ্দিনে টাকার জোগাড় ক'রে ফেলতে পারবো।' সেই প্রসঙ্গে দিদি পূর্ণচ্ছেদ টেনে নিজের কাজে মন দিলেন।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ কী। কিন্তু দিদির ঐ সামান্য পুঁজি থেকে আর কত? যদিও এই নিঃসন্তান বিধবা দিদিটির সেই একমাত্র স্নেহের বন্ধন, তবু তার তো নেবার একটা সীমা আছে? বাবা যতদিন জীবিত

ছিলেন যথেষ্ট উপার্জন করেছেন কিন্তু আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় ক'রে শেষ পর্যন্ত কিছুই তিনি রেখে যেতে পারেননি। বেশি বয়সের মাতৃহীন ছেলের উপর স্নেহটা এতই উগ্র ছিলো যে তার তিলতম স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবেও ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন তিনি। ইংরিজি ভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন নিজে, কাজেই উঁচু মাশুলে ছেলেকে মিশনারি ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন। পোশাক-আশাকের ঘটা ছিলো, আহার ছিলো রাজকীয়, উপরন্তু স্ত্রীলোকহীন সংসার ব'লে খরচের রাখঢাক ছিলো না কিছু। চাকর-বাকররা দু'হাতে লুটতো, খরচ করতো অকারণে, ছড়াতো, ছিটোতো, নষ্ট করতো, পুঁটুলি বাঁধতো— মাঝে-মাঝে দিদি এসে রাশ টানতেন। তিনি চ'লে গেলে আবার যে কে সেই।

তারপর কোনো এক ভাদ্রের টিপটিপ বৃষ্টির অপরাহ্ণে অজ্ঞান অবস্থায় তিনি ফিরে এলেন আপিশ থেকে। যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরাই ধরাধরি ক'রে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, ছুটোছুটি করলেন, রাজ্যের ডাক্তার জড়ো করলেন ঘরের মধ্যে। আর পনেরো বছরের বালক বিনয় ছলোছলো আনত চোখে ব'সে রইলো চুপচাপ পায়ের তলায়। বেলা তিনটে থেকে সমানে হাঁপিয়ে রাত দশটায় থামলো তাঁর গাড়ি। তিনি পৌঁছলেন তাঁর শেষ গন্তব্যে। তিনি স্থির হলেন। এর মধ্যে একবারের জন্তেও চোখ খুললেন না, একটু নড়লেন না, এক ফোঁটা ওষুধ নিতে পারলেন না ভেতরে, কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবল উত্থান-পতনে নাকের একটা পাশ ফেটে গেল। শিহরিত হ'য়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো বিনয়।

তারপর দিদি। রোগা পাৎলা ছিপছিপে ছোট্ট মানুষ। ফুটফুটে ফর্শা। টেলিগ্রাম পেয়ে তক্ষুনি ছুটে এলেন। শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে

হোঁচট খেলেন চৌকাঠের উপর; চোখে জল ভ'রে এলো। কাপড় ছাড়বার অছিলায় দরজা বন্ধ করলেন ঘরে। মাত্রই কয়েক মিনিট, তারপরই ঈষৎ ফোলা-ফোলা চোখে শান্ত মুখে বেরিয়ে এসে মন দিলেন বিধি-ব্যবস্থায়। মৃত্যু তো তাঁর জীবনে নতুন নয়। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর আবাল্য সম্বন্ধ। মা মারা গেছেন পনেরো বছর বয়সে। তারপর ছুটি সন্তান গেছে ও অবশেষে বাইশ বছর বয়সে সব সাধ-আহ্লাদ চুকিয়ে সব সুখ সাপটে নিয়ে স্বামীও ফাঁকি দিয়ে গেছেন তাঁকে। অতএব মৃত্যুতে তাঁর ভয় কী? তা ছাড়া শোক করবার সময়ই বা কোথায়? বিনয় আছে না? তিনি অধীর হ'লে সে স্থির হবে কেমন ক'রে? ঐ তো তাঁর একফোঁটা আশা, অবশিষ্ট আকাজ্ক্ষা। ও ছাড়া আর কী রইলো তাঁর এখন? ওকে রক্ষা করাই তো সবচেয়ে জরুরি কথা। অতএব এগারো দিনের দিন ছোটো একটি অনুষ্ঠান ক'রে বিনা আড়ম্বরে শোককে তিনি বাড়ি থেকে বিদায় দিলেন। কেননা বিনয়ের সে-বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, বরাবর সে ক্লাশে ফার্স্ট হ'য়ে এসেছে, মাস্টাররা আশা করছেন তাকে দিয়ে, এ-সময় এ-সব হাঙ্গামায় শরীর মন নষ্ট করলে সব নষ্ট হবে। পনেরো-ষোলো বছরের কাঁচা হৃদয় থেকে যেন একেবারে উচ্ছেদ ক'রে দিলেন পিতৃশোকটা। স্নেহে, যত্নে, কৌশলে, ভালোবাসার উষ্ণতায় জুড়িয়ে দিলেন আগুন। কী যে হ'লো আর কী না হ'লো, ভালো ক'রে বুঝতেই পারলো না বিনয়। দিদি রইলেন কাছে, সর্বতোভাবে গ্রহণ করলেন তাকে।

পরীক্ষা হ'য়ে গেল, লম্বা ছুটি কাটলো গড়িয়ে-গড়িয়ে, তারপর কলেজ। দেশে ছোটোখাটো তালুকদারি আছে দিদির, এবার না-গেলে

আর চলে না। অতএব উঠলো বাঁড়ির পাট। কতকালের কত স্মৃতি বিজড়িত এই তাদের একতলা বাড়িটি। এই ছেড়ে হস্টেল? বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো। কিন্তু উপায় কী।

সত্যি বলতে দিদি চ'লে যাবার পরেই প্রথম সে ভালো ক'রে উপলব্ধি করলো পিতৃবিয়োগের দুঃখ। যে-ফাঁক অত্যন্ত যত্নে দিদি এতদিন ভরাট ক'রে রেখেছিলেন তা যেন হঠাৎ তাকে গিলে খেতে চাইলো। কী সুখ নতুন কলেজে? স্কলারশিপ না-পেলে কী হ'তো, বন্ধু-বান্ধবের প্রয়োজন কী জীবনে, দুঃখ ছাড়া চারদিকে তাকিয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত যেন আর কিছুই দেখতে পেলো না সে। সব শূন্য। সব ফাঁকা। বেঁচে থাকাটাই মস্ত ভার।

কিন্তু তা-ই কি? ভাবলেন মিস্টার রায়। সেই দুঃখ মুছে ফেলতে তার— সেই ছোটো ছেলেটির— ক'দিন লেগেছিলো? নতুন ডালে কচি পাতা জন্মাতে কতটুকু সময় অপব্যয়িত হয়েছিলো তার? হায়রে বালক! সব ভুলে সব মুছে কবে একদিন তোমার মন ডানা মেললো আকাশে, তা তুমি টেরও পেলে না। কৈশোর ডিঙিয়ে, যৌবনের সিংহদ্বারে এসে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলে তুমি, ফাল্গুন ঝিরঝির ক'রে হাওয়া দিলো; বসন্ত এলো জীবনে। সতেরো পূর্ণ ক'রে আঠারোয় পা দিলো সেই বালক। উন্মীলিত যৌবন তাকে এক অপরূপ রহস্যের দরজায় এনে পৌঁছে দিলো।

আর তার দিদি। তিনি তো তারই ইচ্ছার ছায়া। তার আনন্দের উপকরণ জোগানোই তো তাঁর জীবনের একমাত্র সার্থকতা। টাকা চাই? পাঠাচ্ছি। ছুটিতে বাইরে যাবে? নিশ্চয়ই। কয়েকজন বন্ধু

নিয়ে গ্রামে আসতে চায়? আসুক না। এই ছুটিতে তার দিদিকে চাই কলকাতায়? বেশ তো, ভালো দেখে, ভালো পাড়ায় বাড়ি নাও একটা। তারও যেমন আবদারের সীমা নেই, দিদির তেমন পূরণের ক্ষমতাও অসীম। একটা পাখির পালকের মতো হালকা হাওয়ায় ভেসে-যাওয়া সব দিন। ভেসে-যাওয়া গান। ছ' বছর যেন ছ'টা পলকের চাইতেও দ্রুত।

কিন্তু আর কত? মনে-মনে এখানে-ওখানে চাকরির উমেদারি করতে-করতে ভাবলো বিনয়। এবার আমিই হবো দিদির অভিভাবক। দিদির কর্তা। ছোট্ট তালুকের মস্ত অংশ খ'সে গেছে এই ছ' বছরে, তা এবার ভ'রে তুলবো যত্ন ক'রে।

কিন্তু দিদি নিজের ইচ্ছেতে একেবারে দৃঢ় হ'য়ে রইলেন। বিনয়ের আপত্তি কানেই তুললেন না। সামান্য একটি ভ্রূকুটিতেই তার সব যুক্তি থামিয়ে একখণ্ড জমি বিক্রির চেষ্টায় লোক লাগালেন দিগ্বিদিকে। বললেন, 'সর্দারি করিসনে তো বিনু, চুপচাপ কাছে থাক ক'দিন। তোর টাকার জোগাড় হ'য়ে গেল ব'লে।'

'তত দিনে আমি মস্ত চাকরি নিয়ে তাক লাগিয়ে দেবো তোমাকে।' তবু বিনয় মাথা নাড়লো।

'সেই আশাতেই তো আমি আছি।'— গভীর স্নেহে তিনি ভাইয়ের মাথায় হাত বুলোলেন।

এরই মধ্যে কোনো এক দুপুরে, দিদির তাড়নায় বড্ড বেশি খেয়ে প্রাত্যহিক নিয়মে একখানা বই মুখে নিয়ে অলস বেলা কী ক'রে কাটবে .

এমন একটি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যখন নিক্রিয় মগজকে কিঞ্চিৎ খাটিয়ে নিচ্ছিলো বিনয় এমন সময় ঘরের মধ্যে একটি মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়লো। চমকিত হ'লো সে। দিদি বাড়ি নেই, তিনিও তাঁর প্রাত্যহিক নিয়মে পাশেই জ্ঞাতি-ভাসুরের বাড়ি সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করতে গেছেন সমবয়সী ননদ-জা'দের সঙ্গে। বই থেকে বিনয় চোখ সরালো। দরজার কাছে, একটি ছোটো ছেলের হাত ধ'রে ঈষৎ আনত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। তার খোলা চুলের একটি পাকানো গুছি কাঁধের উপর দিয়ে বুকের কাছে এসে ছড়িয়ে আছে। কালো-পাড় ঢাকাই শাড়ির আঁচলের তলায় রঙিন সুতোর কাজ-করা পাৎলা ব্লাউজ, ঘেমেছে গরমে, রোদ লেগেছে মুখে, ফর্শা গাল লাল, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

'জ্যাঠাইমা বাড়ি নেই ?' একটি পাখি ডেকে উঠলো ঘরের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলো বিনয়— 'হ্যাঁ, এই একটু— আসুন না আপনি।'

'ঘুমুচ্ছেন ?'

'না, এইখানে— ওঁর ভাসুরের বাড়ি— আমি এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি।'

খাট থেকে নেমে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি দেউড়িতে এসে দাঁড়ালো দ্রুত পায়ে। চাকররা গোল হ'য়ে তাস খেলছে সেখানে, মামাবাবুকে দেখে সচকিত হ'য়ে উঠলো তারা।

'এই, যা যা শিগগির যা, দৌড়ে গিয়ে মা-কে ডেকে নিয়ে আয় তো বড়ো কর্তার বাড়ি থেকে।' চাকররা তাস ফেলে ছুটলো আদেশ পালন করতে। আর বিনয় হন্তদন্ত হ'য়ে আবার ফিরে এলো তক্ষুনি ; ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললো, 'বসুন না আপনি, উনি এখুনি এসে পড়বেন।'

শাবেকি আমলের মস্ত বাড়ি। এক সময়ে যে জাঁকজমক ছিলো, চিহ্ন আছে তার। ঘরের ভেতর মেহগনির ভারি-ভারি হাঁপ-ধরা আসবাবপত্র। মকরমুখ টেবিলের কালো বার্নিশে শাদা হাত রেখে প্রকাণ্ড পিঠ-উঁচু চেয়ারটিতে জড়োসড়ো হ'য়ে বসলো মেয়েটি। আর ভাইটি ছুটে চ'লে গেল রান্নাঘরের পেছনে, যেখানে সারি-সারি পেয়ারা গাছে রাশি-রাশি পেয়ারা ধ'রে আছে। প'ড়ে যাচ্ছে, লোকেরা নিচ্ছে, পাখিতে ঠোকরাচ্ছে। পরীক্ষার পরের এই এক মাসের শান্ত সমুদ্রে এই একটু তরঙ্গ। ভালো লাগলো বিনয়ের। এখানকার দিন সত্যিই তার কাটতে চায় না, রাত্রি ফুরোতে চায় না ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে। বইপত্র সে যা নিয়ে এসেছিলো কবে তা শেষ হ'য়ে পুরোনো হ'য়ে গেছে। আগ্রহের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করলো।

'ওটি বোধ হয় আপনার ছোটো ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'খুব মিল আছে কিন্তু।'

মুখ নিচু ক'রে হাসলো মেয়েটি।

'আপনার বাবাকে আমি চিনি।'

'ও!'

'আপনাকেও একবার দেখেছিলাম কালিবাড়ির থিয়েটারে। তখন আপনি ছোটো ছিলেন। দু'তিন বছর আগের কথা বলছি।'

একদিকের কালো ধনুকের মতো ভুরু একটুখানি বেঁকলো, বোধ হয় 'ছোটো' কথাটা মনোমতো হ'লো না।

'আপনার বাবা ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বোধ হয় আপনি—'

'হ্যাঁ, জানি। আমিও আপনাকে দেখেছি, আপনিও তখন—'

পাল্টা জবাবটা দিতে গিয়েও থামলো, তারপর দু'জনেই খানিক-ক্ষণের জন্য চুপ। গ্রামের নিস্তব্ধ দুপুর ঝুলে রইলো মাঝখানে। মুখোমুখি এমন নির্বাক হ'য়ে ব'সে থাকতে একটু বিব্রত বোধ করলো বিনয়। কিন্তু কী-ই বা করা— ভাবলো সে। অপর পক্ষ যদি এত নিস্পৃহ হয়, তা হ'লে একা সে আর কত আলাপ উদ্ভাবন করতে পারে। একবার তো ভদ্রতা হিসেবেও ওর দু'একটা প্রশ্ন করা উচিত? কিন্তু সে নির্বিকার। অগত্যা বিনয়ই আবার কথার অবতারণা করলো, 'দিদির কাছেও আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।'

'আমার কথা?' হাসলো সে, মুহূর্তের জন্য একবার তাকালো বিনয়ের মুখের দিকে। বিনয় চোখ ফিরিয়ে নিলো।

হাঁপাতে-হাঁপাতে দিদি এসে পৌঁছলেন। গা থেকে সিল্কের চাদরটা খাটের বাজুতে রাখতে-রাখতে বললেন, 'ও মা, তুই? যে-রকম ক'রে গিয়ে খবর দিয়েছে ভাবলাম না জানি কী!' কাছে এসে মাথায় হাত রেখে দাঁড়ালেন— 'কী রে, অনসূয়া?'

'মা পাঠিয়ে দিলেন।' —চেয়ার থেকে সে উঠে দাঁড়ালো।

'কেন?'

'আজ বিকেলে আপনারা যাবেন।'

'বোস, বোস। কিন্তু ব্যাপারটা কী, শুনি দেখি?'

অনসূয়া একখানা চিঠি দিলো হাত বাড়িয়ে, 'যেতেই হবে।'

চিঠিটা পড়তে এক মিনিটও লাগলো না। দিদি খুশি-গলায় ব'লে উঠলেন, 'ও মা, এর মধ্যেই ষোলো বছর পূর্ণ হ'লো নাকি তোর? তুই এলি কবে পৃথিবীতে শুনি?' সস্নেহে তাকে আদর করলেন, তারপর বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছাখ বিনয়, আমাদের গ্রামের সেরা মেয়েকে ছাখ। অবিনাশবাবুর বড়ো মেয়ে। বলিনি তোকে?' অনসূয়া কুণ্ঠিত মুখে হাসলো।

'ওর মা আর আমি এই গ্রামে একই দিনে বৌ হ'য়ে এসেছিলাম,' দিদির গলা একটু গম্ভীর হ'লো, 'অবিনাশবাবু আর উনি এক সময়ে বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সে তো আজ সবই গল্পকথা। হ্যাঁ, ক'টার সময় যেতে হবে রে?'

'একটু তাড়াতাড়িই যেতে বলেছেন মা। আর— আর— ওঁকেও মা বিশেষ ভাবে— আপনি— আপনি যাবেন কিন্তু।'

বিনয়ের হ'য়ে দিদিই বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে বৈকি, নিশ্চয়ই যাবে।'

একটু পরেই অনসূয়া চ'লে গেল। বিনয় আবার বিছানায় এলালো বই নিয়ে, দিদি পাশে ব'সে সেই প্রসঙ্গেরই জের টানতে লাগলেন, 'অতি সুন্দর পরিবার, বুঝলি?'

'অনেক বার শুনেছি।'

'গ্রামে এই একটা বাড়ি, যাদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করা যায়।'

'হুঁ,' বিনয় পাশ ফিরলো।

'যাবি তো, দেখবি, বাড়িটি যেন একখানা ছবি। বাগান, পুকুর, সব যেন সাজানো। জমিজমা তো কিছু নেই, সম্পত্তির মধ্যে ঐ তো

কয়েক বিঘে জমির উপর একটা দালান। অথচ এমন সুন্দর ক'রে রেখেছে দেখলে আমাদের এ-সব বাড়িকে একটা আঁস্তাকুড় মনে হয়। অথচ এই ছাখ, আমার শ্বশুর তো এ-অঞ্চলে একটা সোজা ধনী লোক ছিলেন না? এত বড়ো বাড়ি গ্রামে আর ক'টা আছে? অতিথিশালা, নাটমন্দির, পুজোমণ্ডপ—'

হাতের বইটা বন্ধ করলো বিনয়।

তিন

একটু আনমনা হ'লেন মিস্টার রায়। পরিষ্কার, স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠলো সেই সব দিন, সেই সূর্যাস্তের মুঠো-মুঠো আবির-ছড়ানো বিকেল, অবিনাশবাবুর দক্ষিণজোড়া ফুলের বাগান, লাল টালির পেছনে সবুজ রঙের সবজির ক্ষেত। সুন্দরী তন্বীর মতো নারকেল সুপুরির কুঞ্জ। থেকে-থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া ব'য়ে যায় তার ভেতর দিয়ে, পুকুরের জলে তার ছায়া কেঁপে-কেঁপে ওঠে। অনসূয়া ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় সেই বাগানে।

এই তো সেদিনের কথা, যেদিন বাঁধানো ঘাট পুকুরের লতাবিতানে অনসূয়া এসে দাঁড়ালো তাঁকে নিয়ে, ঈষৎ লজ্জা-লজ্জা মুখে বললো, 'জ্যাঠাইমা না জানি কত কী বলেছেন আপনাকে, এই তো আমাদের বাগান পুকুর সব।'

মুগ্ধ বিনয় চার দিকে তাকালো, তাকালো অনসূয়ার নরম মুখের দিকে। জবাব দিলো, 'ভাবছি দিদির অবাধ্য হ'য়ে যদি না আসতুম, ভারি ঠকে যেতুম। এমন সুন্দর একটি স্মরণীয় বিকেলই বাদ প'ড়ে যেতো আমার জীবন থেকে।'

'আসতে চাননি বুঝি?' চোখের কাজল-ডোবানো লম্বা পলক ছায়া ফেললো গালে, 'কেন?'

'না-এলেও তো কারো চোখে পড়তো না?'

'তা হ'লে আর দুপুরের রোদ্দুর ভেঙে সেনপাড়ায় যাবার দরকার ছিলো কী? জ্যাঠাইমা তো বাড়ির মানুষ, তাঁকে তো কাল মালির হাতে চিঠি পাঠালেই চলতো।'

'আমার জন্যে ?'

'কী মনে হয় ?'

'ভাগ্যকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করছে যে।'

'অবিশ্যি আমি না-গিয়ে আমার বাবার যাওয়াটাই বোধ হয় উচিত ছিলো বেশি।' উদাসভাবে মাধবীলতার পাতা ছিঁড়লো একটি— 'কিন্তু তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে—'

বিনয় আনত হ'লো, 'মার্জনা চাইছি, অন্যায় হয়েছে। অনুমতি করেন তো একটু বসি এখানে—' শান-বাঁধানো চত্বরের উপরই বসতে যাচ্ছিলো, সারা শরীরে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো অনসূয়া, 'ও কী, আমি এক্ষুনি মাদুর নিয়ে আসছি একটা, ভীষণ ধুলো— একদম নোংরা হ'য়ে যাবে যে জামা-কাপড়—'

'কিচ্ছু দরকার নেই,' বাধা দিলো বিনয়— 'আপনি না-হয় এটা পেতে বসুন, শাড়িটা বাঁচবে।' হাতের মস্ত সুগন্ধি রুমালটা ছুঁড়ে দিলো অনসূয়ার দিকে।

'আমি— আমি বসবো না।' মস্ত মোটা পাকুড়গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছবির মতো দাঁড়ালো অনসূয়া— 'আমার অনেক কাজ আছে যে।'

'কাজ! আজ আবার কাজ কী ? নিজের জন্মদিনে আবার কেউ নিজে কাজ করে নাকি।'

অনসূয়া হাসলো, ছোট্ট একটি টোল পড়লো গালে।

জন্মদিনের উপহার, একটু জমকালো শাড়ি পরেছে। টালি রঙের জরির কাজকরা সুদৃশ্য ঢাকাই জামদানি। কপালে ছোটো-ছোটো চন্দনের

ফোটা, ঈষৎ বাদামি ছাঁদের মুখ, নাকের বাঁ পাশে কুচকুচে কালো এইটুকু একটা তিল। বিনয়ের চোখ একটু সময়ের জন্ম থেমে রইলো সেখানে। শরতের মেঘ-ভাসা আকাশের তলায়, পুকুরের নির্জনে, বিকেলের ঘরে-ফেরা পাখির কাকলিতে, রঙিন বাগানের পরিবেশে সব যেন কেমন অবাস্তব লাগলো তার। এক টুকরো মাটির শক্ত ঢেলা টুপ ক'রে জলে ছুঁড়লো সে, গোল-গোল বৃত্তে ছড়াতে-ছড়াতে জলের সেই ঢেউ গিয়ে কম্পন তুললো শালুক ফুলের গোল-গোল ছাতার মতো সবুজ পাতায়। ফুলগুলো উঁচু হ'য়ে মাথা নাড়লো।

'আপনি সাঁতার জানেন?'

'জানি না!' ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু নেচে উঠলো কৌতুকে।

'আমাকে শিখিয়ে দিন না।'

সলজ্জ অনসূয়া চোখ নামালো।

'যদি সাঁতার জানতাম তা হ'লে এক্ষুনি ছিঁড়ে নিয়ে আসতাম ঐ ফুলটা।'

'বা রে, ওটার জন্তে আবার সাঁতারের দরকার হয় নাকি?' মৃদু হাস্তে একেবারে জলের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো অনসূয়া, আর সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো বিনয়, 'প'ড়ে যাবেন, প'ড়ে যাবেন—' দস্তুরমতো ত্রাস ফুটলো তার গলায়। একটু হেসে, পায়ের পাতায় লুটোনো শাড়িটা সামান্য তুলে খানিকটা নেমে হিজল গাছের শুকনো ডাল দিয়ে আঁকশির মতো ধীরে-ধীরে সে ফুলটা তীরের দিকে টেনে আনলো, তারপর হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিলো বোঁটাসুদ্ধ। একটু ভিজলো অবিশ্যি শাড়িটা, কিন্তু ফুলটা হাতে ক'রে তীরে ওঠবার সময় খুশিতে উদ্ভাসিত দেখালো তাকে।

'নিন।' কাছে এসে দাঁড়ালো— 'কাল যদি আসেন আরো ফুল আমি তুলে রাখবো স্নানের সময়।'

'আবার কাল আসবো ?'

'দোষ কী।' একটু থেমে, 'খুব সকালে একদিন এলে অনেক রঙিন ফুল দেখা যায়। মা-র বাগানে কী সুন্দর লাল জবা ফোটে, আমার একটা বারোমেসে ডালিয়া গাছ আছে, আর তা ছাড়া ঘাসফুল, কদমফুল, কুঞ্জলতা, অপরাজিতা, সব তো সকালের দিকে।'

'তা হয়তো দেখা যাবে, কিন্তু যিনি দেখাবেন তাঁর দর্শন মিলবে কী ?'

'কেন ?'

'ফুলেরা যখন শিশির-ধোওয়া হ'য়ে ফিটফাট, আপনি তো নিশ্চয়ই তখন ঘুমের—'

অনসূয়া কথা শেষ করতে দিলো না— 'ঘুম ! আমি তো কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-চারটের সময় উঠি রোজ।'

'সাড়ে-চারটের সময় !'

'ও-সময়টা ভারি সুন্দর। না-উঠলে আমার সারাটা দিন মন-খারাপ হ'য়ে থাকে।'

এতক্ষণ নিচু হ'য়ে পায়ের কাপড়টা নিংড়ে নিচ্ছিলো সে, মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালো আর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনয়ের যুবক-হৃদয় কেঁপে উঠলো থরথর ক'রে। একটু অন্যমনস্ক হ'লো সে। তারপরেই হঠাৎ কী মনে পড়লো তার, পকেট থেকে হলদে সাটিনে বো বাঁধা ছোট্ট একটি বহুমূল্য ফরাসি সেন্টের লাল বাক্স বের ক'রে বললো, 'দেখুন তো, এ-গন্ধটা আপনার কেমন লাগে ?'

মুহূর্তের জন্য চোখে-চোখে তাকালো অনস্থয়া।

'এটাও নিন, খোঁপায় পরুন, সুন্দর দেখাবে কালো চুলে লাল ফুল।'

অনস্থয়ার মুখে সূর্যাস্তের লাল ছায়া ভাসলো।

'মাদ্রাজি মেয়েদের দেখেননি? তাদের তো ফুল চাই-ই চুলে। আমার এত ভালো লাগে। পরুন না, পরুন।' প্রায় ছেলেমানুষের মতো আব্দার করলো বিনয়।

অনস্থয়া মাথা নিচু ক'রে চুপ।

চার

বাইরের বারান্দা ততক্ষণে ভ'রে গেছে অতিথি-সমাগমে। অবিনাশবাবু আপ্যায়ন করছেন তাঁদের। আস্তে-আস্তে বিনয় এসে দাঁড়ালো সেখানে। তাকে দেখতে পেয়ে সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, 'এসো, এসো, তোমার কথাই হচ্ছিলো।'

বিনয় সহাস্যে উঠে এলো বারান্দায়, 'আপনার বাগান দেখছিলাম।'

'আমার বাগান!' অবিনাশবাবু হাসলেন, 'তোমাদের কলকাতার চোখে তো এ-সব বনবাদাড় হে!'

'চমৎকার। এটাকে পাব্লিক পার্ক ক'রে দেওয়া উচিত আপনার। তা হ'লে আমি রোজ এসে ব'সে থাকি।'

এবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন তিনি। খুশি তাঁর শতধারে বিচ্ছুরিত হ'লো। 'বলো কী, অ্যা? এ যে আমাদের একটা মস্ত সার্টিফিকেট। লিখিয়ে নিতে হয়। কী বলেন—' তিনি চার দিকে তাকালেন, চার দিক মাথা নাড়লো তাঁর দিকে তাকিয়ে।

অভ্যাগতেরা সকলেই প্রায় অবিনাশবাবুর বয়সী, অধিকাংশই স্কুলের শিক্ষক। সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি। তারপর বললেন, 'তোমার কাছে আমাদের কিন্তু একটা আবেদন আছে আজ।'

'আমার কাছে! আমার কাছে আপনাদের কী আবেদন'— বিনয় সবিনয়ে হাসলো।

'তুমি তো এখন নিশ্চয়ই কিছুদিন এখানে আছো?'

'কেন বলুন তো?'

'এঁরা সবাই বলছিলেন,—' সবাই এখানে সায় দিলো— 'সে-সময়টা যদি, অন্তত মাস পাঁচেকের জন্যও তুমি আমাদের স্কুলের ম্যাট্রিকের ছেলেদের ইংরিজিটা একটু দেখে দাও— আমাদের হেডমাস্টার অর্থাৎ যামিনী সেন ভারি চমৎকার লোক। তাঁর নিজেরই আজ এখানে এসে তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু—'

'অবিনাশবাবুই আমাদের হেডমাস্টার ধ'রে নিতে পারেন।' আরেকজন পাকা মাথা যোগ দিলেন কথায়।

অবিনাশবাবু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, 'না, না, তা নয়, তবে— আসলে হয়েছে কী জানো? আমাদের ইংরিজির স্টাফ ভারি দুর্বল। ছেলেরা দু'বছর ধ'রে একেবারেই ভালো করতে পারছে না। তাই যামিনীবাবু তোমার কাছেই আমাদের মারফৎ এই আবেদনটা পাঠাচ্ছেন, তোমাকে রাজি হ'তেই হবে।'

'হ্যাঁ, এটাতে আপনাকে রাজি হ'তেই হবে।' সায় দিলেন সকলে।

'বেশ তো! ভালো কথাই তো। আমার পক্ষে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়, তবে আমি ঠিক ক'দিন থাকবো সেটা—' একটু ইতস্তত করলো বিনয়।

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, শুনলাম বিলেত যাচ্ছো? তা বোঠান যে-রকম বললেন তাতে তো মনে হচ্ছে কিছু বিলম্বই আছে তার।'

'আমি কাল আপনাকে ঠিক ক'রে বলবো—'

'বেশ, বেশ, সেই ভালো, একটু ভেবে-চিন্তে নেওয়াই বরং ভালো। কী বলেন?'

'তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনাকে আমাদের চাই-ই।'

ভেতর থেকে খাবার ডাক নিয়ে এলো ছ'বছরের মেয়ে বুলু। চাপা পড়লো সেই প্রসঙ্গ। সবাইকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অবিনাশবাবু।

ষোলো বছরের জন্মদিনে আয়োজনটা একটু বিশেষই হয়েছিলো সেদিন। বাড়ির তৈরি অতি সুখাদ্য, সুস্বাদু, আর সুদৃশ্য সব আহার্য। লুচি বেগুনভাজা ছোলার ডাল থেকে আরম্ভ ক'রে, ডিমের কচুরি, মাছের চপ, নারকেলের দুধ দিয়ে চিংড়ি মাছের মালাইকারি, আলুবখরার চাটনি পর্যন্ত। মিষ্টির লাইনের সব নাম এখন আর কিছুতেই মনে আনতে পারবেন না মিস্টার রায়, কিন্তু তার চেহারা, তার আস্বাদ এখনো যেন ইচ্ছে হ'য়ে লেগে আছে মনের মধ্যে। কত যে নারকোলের খাবার করেছিলেন ভদ্রমহিলা। মস্ত থালার উপর তাদের কত চেহারা! ছোটো-ছোটো তাজমহল, পানসি নৌকো, কৃষ্ণনগরের বুড়ো, ঠাট্টাভাজনদের জন্যে টিকটিকি গিরগিটি,— সব তৈরি করেছেন নারকোল দিয়ে, খড়কে ফুঁড়িয়ে ফুঁড়িয়ে। কী ক'রে করেছিলেন, আশ্চর্য!

অনসূয়া পরিবেশনে সাহায্য করছিলো তার মা'কে, খেতে-খেতে একবার চোখ তুলে লক্ষ্য করলো বিনয়— কালো খোঁপায় মস্ত একটি লাল পদ্ম। চোখ নামিয়ে নিলো সে। জন্মদিনের চা-পার্টিতে এসে রাত্তিরের ভোজ সমাধা ক'রে, কেয়াফুলের জল আর কেয়াখয়েরের পান খেয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি সহকারে বাড়ি ফিরলো সবাই।

রাত্তিরে শোবার আগে দিদি বললেন, 'কেমন লাগলো?'

বিনয় বললো, 'ভালোই তো।' তারপর আরো রাত্তিরে ভাদ্রের গুমোট ভেঙে যখন অবিরলধারে বৃষ্টি নামলো, পচা পুকুরের ধারে ব্যাং

ডাকলো মোটা গলায়, ঝোপে-ঝাড়ে ঝিঁ-ঝিঁর ডাক বন্ধ হ'লো, অতি মনোরম একটি শিরশিরে ঠাণ্ডায় ভাঙা-ভাঙা ঘুমে, পায়ের উপর চাদর টেনে নিতে-নিতে কেমন একটা মধুর ভালো লাগায় ছেয়ে গেল বিনয়ের সমস্ত হৃদয়। দিদি এসে মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন।

পাঁচ

শুধু স্কুলেই নয়, এক মাসের মধ্যে অনসূয়ার মাস্টারিতেও বহাল হ'লো বিনয়। প্রথম-প্রথম ছুটির দু'দিন, অর্থাৎ শনিবার আর রবিবার বিকেলে, তারপর সপ্তাহে চার দিন, পুজোর ছুটির পরে একেবারে সাত দিন। পরীক্ষা এসে গেছে, এখন না-খাটলে চলে না। অবিনাশবাবু মেয়েকে পড়িয়েছেন অনেক, কিন্তু পরীক্ষার জন্য তৈরি করেননি। সে-দায়িত্ব বিনয় নিলো। ফলে রাত জেগে আবার নতুন ক'রে আয়ত্ত করতে হ'লো ভুলে-যাওয়া অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল মুখস্থ হ'য়ে গেল। একদিন দিদি বললেন, 'একমাথা বিদ্যে কি তুই এই মাস্টারিতেই ক্ষয় করবি?'

'মন্দ কী। ব'সে থাকার চেয়ে তো ভালো।'

'আমার তো টাকা প্রস্তুত, এবার তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারিস।'

'ভাই লণ্ডন-ফেরতা না হ'লে বুঝি দিদির সম্মান থাকবে না?'

'তা তো থাকবেই না, যে যার যোগ্য।'

'জমিদারি লাটে উঠিয়ে এ-সব খরচ জোগানো মোটেও আমার ভালো লাগছে না।'

'লাটে উঠলে নিশ্চয়ই জোগাতাম না, কিন্তু অত সব কথায় তোর দরকার কী? তুই জোগাড়-যন্তর কর।'

'শীতটা কাটিয়ে যাওয়াই আমার সুবিধে।'

'তার আর বাকি কী?' দিদির মুখে একটি ছায়া পড়লো। একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'অবিনাশবাবুর মেয়েকে কি তোর রোজই পড়াতে হয় আজকাল?'

'রোজ।'

'পরীক্ষার তো ঢের দেরি।'

'দেরি!' চোখ কপালে তুললো বিনয়, 'আর মাত্র তিনটে মাস। লাফিয়ে চ'লে যাবে।'

'একবার কলকাতা যাবো ভাবছিলাম।'

'কেন? দরকার আছে?'

'না, তেমন আর কী? যাই না অনেক দিন, থেকে আসতাম দু-এক মাস। আমি ভাবছি মার্চ মাসের মধ্যেই তোকে ঠিকঠাক ক'রে পাঠিয়ে দেবো।'

'মার্চ মাস!' মনে-মনে একটু হিসেব করলো বিনয়। 'মার্চ মাসে হবে না, এপ্রিলের মাঝামাঝি রওনা হবো, তত দিনে ওর পরীক্ষা-টরীক্ষা সারা।'

দিদির মুখের ছায়া গভীর হ'লো। খানিক চুপচাপ থেকে বললেন, 'কাল অবিনাশবাবুর ভাই এসেছিলেন।'

'কে? ঐ লম্বা ভদ্রলোক?'

'পরিচয় হয়নি?'

'ঐটুকুই মাত্র। এলেনই তো বুঝি বুধবার।'

'লোকটাকে আমার কোনোদিনই ভালো লাগে না। অবিনাশবাবু এত ভালো, অথচ ওঁর ভাই—'

'কেন এসেছিলেন?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রত্যেক বছরই তো দু-একবার আসেন, আমার সঙ্গে কবে দেখা করেছেন মনেও পড়ে না।'

'ভাইঝিকে পড়াই ব'লে কৃতজ্ঞতা?' বিনয় হেসে ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবি টেনে গায়ে দিলো বেরুবার জন্যে।

'কৃতজ্ঞতা না হোক— উপলক্ষ্যটা যেন তা-ই মনে হ'লো।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ— ধরি মাছ না ছুঁই পানি, উকিলি বুদ্ধি তো, কত প্যাঁচে যে কথা কইতে পারে লোকটা! তোর ভগ্নীপতি বলতেন, ও আর জন্মে হয় নাপিত নয় শেয়াল ছিলো। আমার মনে হয় কী জানিস, তোর যাওয়াটা ওঁর বেশি পছন্দ নয়।'

ফিরে দাঁড়ালো বিনয়— 'কোথায় যাওয়া? ওঁদের বাড়ি? না অনসূয়াকে পড়ানো?'

'দুটোই।'

'কেন? তাতে ওঁর কী?'

'সেটা অবিশ্যি উনিই জানেন। তবে কথাবার্তার ধরনে আমার এই মনে হ'লো।'

একটু থমকে থেকে বিনয় বললো, 'যাক গে, আমি তো আর ওঁর বাড়ি যাচ্ছি না, ওঁর মেয়েকেও পড়াচ্ছি না, কাজেই ওঁর ইচ্ছের উপরও নির্ভর করছে না কিছু।'

'তোর না-করতে পারে কিন্তু অবিনাশবাবুর পরিবারে এই ভাইয়ের অসম্ভব প্রতিপত্তি। অবিনাশবাবু বলতে গেলে ওঁর কথাতে ওঠেন বসেন।'

'কেন?'

'এই এক রকম অন্ধতা।'

'বাজে।' বৈঠকখানা-ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলো বিনয়, সেনপাড়া ডিঙিয়ে চৌধুরীপাড়ার মোড়ে এসে বড়ো দিঘির ধারে দাঁড়ালো একটু, বিকেলের ঝাপসা আলোয় হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর কী ভেবে আবার ফিরলো। এই সময়টায় দিদি ঘরে-ঘরে আলো দেখান, প্রদীপ জ্বালেন লক্ষ্মীর পটের কাছে, হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে চুপচাপ ব'সে থাকেন আসনে। একেবারে নিঃশব্দে। চার পাশ থেকে মশার গান ওঠে, জড়িয়ে ধরে দিদিকে, দিদি নড়েন না। আসন পেতে ব'সে পুজো-আহ্নিক করার কী মানে হয় তা বিনয় জানে না, কিন্তু এই মুগ্ধতা, একাগ্রতাটা কেমন ভালো লাগে তার। এই একাগ্রতা সে জানে, পড়তে বসলে চিরকালই সে এই একাগ্রতা অনুভব করেছে নিজের মধ্যে। কিন্তু দিদি কী ভেবে একাগ্র হন? ঈশ্বরকে? না তাঁর মৃত সন্তানকে? না কি বহুদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া স্বামীর মুখ? কী জানি! পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে দিদির দিকে তাকিয়ে পা টিপে-টিপে নিজের ঘরে চ'লে এলো সে। ঘসা কাচের ডোমের তলায় টেবল-ল্যাম্পের নরম আলো ছড়িয়ে আছে সেই ঘরে। পরিষ্কার নির্ভাঁজ বিছানা, গুছোনো আলনা, থাকে-থাকে বই সাজানো টেবিল। দিন পাঁচেক আগে মস্ত এক পার্সেল এসেছে বই-বন্দী হ'য়ে, ঝকঝক করছে সেই বইগুলো। এর মধ্যে অনসূয়ার মা-র জন্যেও দু-খানা ছিলো, ভদ্রমহিলা ভারি ভালোবাসেন পড়তে। আনিয়ে দিয়েছে বিনয়। কেউ পড়তে ভালোবাসে দেখলেই ভালো লাগে তার। ও-বাড়ির ছোটো ছেলে-মেয়েগুলোও পড়তে লিখতে ভালোবাসে। এই জন্যেই ও-বাড়িটা এত ভালো লাগে বিনয়ের। কিন্তু থাক, আর যাবে না সে। দিদির মুখের

দিকে তাকিয়ে না-যাওয়াই ভালো ; এটা তো ঠিক, উনি যখন মুখ ফুটে বলেছেন কথা, তখন বিষয়টা অবহেলার যোগ্য নয়। এ-রকম তো দিদি কখনো বলেন না। তার ইচ্ছেয়, তার স্বাধীনতায় তো আজ পর্যন্ত তিনি কথা বলেননি।

নতুন বইয়ের সারি থেকে একটা বই তুলে নিলো হাতে। কোরা গন্ধটা শুঁকলো একটু, একটু পরেই চোখ নিবিষ্ট হ'লো সেই নিঃশব্দ কালো অক্ষরের রহস্যে।

তার পরের দিনও গেল না বিনয়, তার পরের দিনও না।

রাত্রিবেলা শোবার আগে দিদিকে বললো, 'সত্যি যাবে নাকি কলকাতা ?'

দিদি চুপচাপ তাকিয়ে দেখলেন একটু ভাইকে, তারপর বললেন, 'তোর কী ইচ্ছে ?'

'আমি তো যাবোই স্থির করেছি। ব'সে-ব'সে আর কতো ভালো লাগে।'

'কেন, স্কুল তো আছে।'

'ও, স্কুল ! ও-সব শখের কাজ থাক।'

'অনসূয়া ?'

দিদির তির্যক দৃষ্টি এড়িয়ে শেলফ থেকে বই ঝাঁকালো বিনয়। একটু পরে বললো, 'সেটা অবিশ্যি একটা মস্ত কথা, দায়িত্ব যখন নিয়েছি, কিন্তু ওরা নিজেরাই যেখানে সে-বাধা সরিয়ে দিতে ইচ্ছুক সেখানে আর আমার দোষ কী।' শুয়ে পড়লো সে, 'মোটমাট— তুমি যদি যেতে চাও, আমি কলকাতা গিয়ে বাড়ি ঠিক করতে পারি।'

দিদি কিছু না-ব'লে মশারি ফেলে দিলেন, লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখলেন দরজার কোণে, তারপর চলে গেলেন নিজের ঘরে!

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো অবিনাশবাবুর ব্যস্তব্যাকুল গলার স্বরে, 'বিনয়, বিনয় কই হে?'

ডাক শুনে চমকে উঠলো বিনয়, মুহূর্তে উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে, তার সচেতন মন হঠাৎ উপলব্ধি করলো এই রকম একটি আহ্বানের প্রত্যাশাতেই সে অধীর আগ্রহে উন্মুখ হ'য়ে ছিলো দিন আর রাত। দু'দিন না-গিয়ে অনেক বিষয় মনে-মনে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে সে। ভেবেছে, বুঝেছে, তর্ক করেছে, খণ্ডন করেছে, অস্থির হ'য়ে একা-একা ঘুরে এসেছে নদীর ধারে, কিন্তু আজ এই সুন্দর শীতের সকালে, সব কুয়াশা ঠেলে একটি জ্যোতির্ময় আলোয় সে খুব ভালো ক'রে দেখতে পেল নিজেকে। মন যেন প্রস্তুত হ'য়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। আলোয়ান জড়িয়ে বাইরে এসে হাসিমুখে বললো, 'আসুন। এই ভোরে?'

'তা হ'লে ভালো আছো তুমি।' বিনয়কে দেখে আশ্বস্ত হ'লেন। 'আমি আরো ভাবলাম কী জানি অসুখ-বিসুখ করলো নাকি।'

'না, না, ভালোই আছি। ঘরে আসুন।'

'ঘরে?' একটু চিন্তা ক'রে মাথা নাড়লেন, 'না, ঘরে আর আসবো না, বৌ[illegible] তাঁকে বরং ডাকো একটু— একবার দেখা ক'রে যাই, আমার আবার নী[illegible] যেতে হবে এক্ষুনি।'

'আসুন, আসুন, বা, তা কি হয়?' মাথার আঁচল তুলতে-তুলতে দিদি এলেন ত্রস্ত পায়ে, 'ঘরে না-হয় আইবুড়ো মেয়ে নেই, ছেলে তো আছে? তার তো বিয়ে হবে না না-বসলে।'

'বটে, বটে!' দু'পা উঠলেন সিঁড়িতে। জোরে হেসে উঠলেন—'সোনার আবার মূল্যের ভয়।' বুক-সমান উঁচু স্নিগ্ধ, দিদিও নামলেন দু'সিঁড়ি, 'এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যান।'

'আমার বড়ো তাড়া বৌদি, নীলখেতের রাস্তা— জানেন তো রোদ চ'ড়ে গেলে ভারি কষ্ট হয় হাঁটতে।'

'নীলখেতে কেন?'

'আর বলবেন না। রায়ৎজনেরা যা হয়েছে আজকাল। মান্য নেই, মাননা নেই, ভয় ডর যেন কিছু নেই। এই দেখুন, তিন দিন আগে জনাবালি মিয়া দু'গাছ নারকোল নিলো, দশ গাছ সুপুরি— অর্ধেক টাকা দিয়ে বললো, এই কালই বাকি টাকা নিয়ে আসবো কত্তা— ব্যস্, আর পাত্তা নেই তার।'

'বিক্রি করলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, বিকাশ এসেছে কিনা, ওর কিছু টাকার দরকার—'

'ছেলেপুলে হবে বুঝি?'

অবিনাশবাবু মাথা চুলকোলেন, 'হ্যাঁ, মানে, এই বোধ হয়—'

আর বোধ হয় কেন। এ তো গ্রামের সকলেই জানে। অসময়ে এসেছে বিকাশ, তা ছাড়া কোলেরটি তো এক বছর পূর্ণই করেছে। দিদি হাসলেন।

'এই দেখুন, সেই টাকাটা আদায় করতে যেতে হচ্ছে আবার তিন মাইল ঠেঙিয়ে, বুঝলেন না, বুড়ো তো হলাম, শরীরে এখন আলস্য হয়েছে।'

'তা বিকাশ ঠাকুরপো নিজে গেলেই তো পারতেন, দরকার তো তাঁরই। তা ছাড়া আপনার তো আবার ইস্কুলও আছে।'

'না, না, ও কোত্থেকে হাঁটবে এই বিতিকিচ্ছিরি রাস্তায়! ওদের এক পা হাঁটলে ট্রাম, দু'পা হাঁটলে বাস্, গাড়ি ঘোড়া রিক্শা কত কী— আর এই সব গ্রামের এঁদো রাস্তা— তা হ'লে তুমি ভালোই আছো, অ্যাঁ? যাওনি দেখে আমি আবার—' তিনি উঠোনে নামলেন।

'আজ যাবো।' বিনয়ও নেমে এলো সঙ্গে-সঙ্গে, কথা বলতে-বলতে এগিয়ে এলো ফটকের বাইরে। পুকুরের ধার দিয়ে, শিকদার-পাড়া পর্যন্ত এসে থামলো। অবিনাশবাবু চ'লে গেলেন। তিনি চ'লে গেলেও সে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। একটু রোদের তাপ, একটু হাওয়া, বেশ লাগলো দাঁড়িয়ে। মনটা মুহূর্তে হালকা হ'য়ে গেল। খুশির আমেজ লাগলো বাতাসে।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে, চা খেয়ে, আস্তে অনেক পরে বিনয় রওনা হ'লো অনস্য়াদের বাড়ি। পৌছতে-পৌছতে অন্ধকার ছেয়ে এলো। ফটক খুলতেই ছুটে এলো তার ছোটো বোন বুলু, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, চকচকে চোখ, অনেকটা অনস্য়ারই মতো দেখতে, অত ফর্শা না। বিনয় সাগ্রহে দু'হাতের ফাঁকে তাকে জড়িয়ে নিলো। সে মাথা ঝাঁকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'আসেননি যে?'

'রাগ করেছিলাম।'

'কেন?'

'তোমরা আজকাল মোটে খাতির-যত্ন করো না, কোথায়-কোথায় থাকো।'

'তাই তো, বাজে কথা কেবল!' ছ' বছরের মেয়ে, কথায় একেবারে গিন্নি। বিনয় তার আঙুল ধ'রে বারান্দায় উঠলো, কেমন নিস্তব্ধ

বাড়ি। 'বাবলু মণ্টু কই ?' বাবলু চার বছরের, মণ্টু এক। 'মণ্টুকে আজ মা মেরেছেন, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে-কাঁদতে।'

'কেন ? মেরেছেন কেন ?'

'রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের মুখে মুখ লাগিয়ে চুমু খাচ্ছিলো যে। তারপর সেটার গলায় দড়ি বেঁধে আবার রান্নাঘরে নিয়ে এসেছে মা-র কাছে— বলে, ও আমাদের চাকর হবে।' হেসে ফেললো বিনয়। 'তাই জন্যে মারলেন ?'

'মেরেছেন তো ভারি, আসলে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ব'লেই যত কান্না—'

'মা কই ?'

'কত সব রান্না হচ্ছে বিনয়দা—' বুলু কানের কাছে ফিসফিসোলো, 'কাকা কালই চ'লে যাবেন কিনা, তাই পোলাও, মাংস, বাবা আবার বড়ো-বড়ো রসগোল্লা এনেছেন তালতলার বাজার থেকে—' লোভে তার চোখ আতুর হ'য়ে উঠলো।

'দিদি কই ?' এতক্ষণে ধানাই-পানাই শেষ ক'রে আসল নামটি উচ্চারণ করলো বিনয়।

'দিদি পড়ছে।'

'তবে চলো সে-ঘরেই যাই।'

'তার চেয়ে এসো না আমি তুমি এখানে ব'সে-ব'সে অনেক গল্প করি।'

বিনয় হেসে বললো, 'সেটাই সব চেয়ে ভালো। কিন্তু দিদির কিনা পরীক্ষা, চলো না একবার দেখে আসি।'

'না, আমি যাবো না, গেলে দিদি ব'কে দেয়।'

'সাধ্য কী! আমি আছি না!' কী জানি কেন, প্রত্যেক দিনের মতো সহজ গতিতে অনসূয়ার ঘরে যেতে পা চলছিলো না বিনয়ের। বুলুকে শিখণ্ডী ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে তার ঘরে এসে পৌঁছলো।

পেছন ফিরে আলোর তলায় নিচু হ'য়ে চিঠি লিখছে অনসূয়া, একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখলো বিনয়, বুলু ডাকলো, 'দিদি!' অনসূয়া চোখ ফিরিয়েই উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ঠেলে। বোনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'বাবা এসেছেন?'

'না।'

'কাকা বাড়ি নেই?'

'রেবতীকাকার বাড়ি গেছেন যে।'

'ও!' যেন এতক্ষণে খেয়াল হ'লো বিনয়কে, 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না। তুমি পড়তে যাও, বুলু।'

বুলু ক্ষুন্নমনে চ'লে গেলো, বিনয় বসলো মুখোমুখি চেয়ারে। টেবিলের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে বললো, 'কী পড়বেন আজ?'

'পড়বো না।'

'কাজ আছে কোনো?'

'না।'

'তবে?'

অনসূয়া জবাব দিলো না।

'চ'লে যাবো?'

'সেটা তো আপনার ইচ্ছের উপরই নির্ভর করে।'

'আপনার কী ইচ্ছে ?'

'বুদ্ধিমানেরা সর্বদাই নিজের ইচ্ছার অধীন।'

'আর হৃদয়বানেরা ?' বিনয় হাসলো।

'তারা তো সব বোকা। সেন্টিমেণ্টাল।'

'আমাকে কী মনে হয় ? হৃদয়বান, না বুদ্ধিমান ?'

'বুদ্ধির খ্যাতিই তো শুনে আসছি ক'মাস ধ'রে।'

'হৃদয়ের তো আর খ্যাতি হয় না, ওটা অনুভবের। আপনার কী মনে হয় ?'

'জানি না।'

'নীল কাগজে কাকে চিঠি লিখছিলেন ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অনসূয়া বললো, 'আপনাকে।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী লিখছিলেন ?'

'আপনার অনেকগুলো বই প'ড়ে আছে এখানে, সেগুলো ফেরৎ দেবার কথা, তা ছাড়া আপনার কলমটা, রেক্সিনে বাঁধাই খাতাটা—'

'আর ?'

'আর-কিছু মনে পড়ছে না।'

'সব ঠিক ক'রে রেখেছেন ?'

'রেখেছি।'

'চিঠিটা ?'

'শেষ হয়নি।'

'যতটুকু হয়েছে তা-ই দিন।' বিনয় হঠাৎ হাত বাড়ালো প্যাডের উপরে, তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লো অনসূয়া, 'না, না কিছুতেই না, কক্ষনো না।'

'আমার চিঠিই তো!'

'হোক, আমি. দেবো না।' কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেললো সেই কাগজ, উঠে গিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিলো নিচে। তারপর জানলার শিক ধ'রেই দাঁড়িয়ে রইলো পিছন ফিরে।

'তা হ'লে আজ পড়বেন না?'

'না।'

'না-পড়লে ফেল করবেন।'

'জানি।'

'তবে পড়বেন না কেন?'

' "কেন"র কি কোনো কৈফিয়ৎ আছে?'

'আছে বৈকি।'

'থাকলে তো আপনার কাছেও কেউ সেই কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারে।'

'করুক না।'

'থাক।'

'আপনি কি ঐ জানলার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'কী এসে যায়?'

'মুখ না-দেখলে কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'না-লাগলে আর কী করা যায়।'

'শুনুন!'

'বলুন।'

'এখানে আসুন।'

'বলুন।' এবার জানলা থেকে স'রে এলো অনসূয়া। খুলে-পড়া খোঁপা হাতে জড়িয়ে বেঁধে নিয়ে গুছিয়ে বসলো চেয়ারে। 'বলুন।'

'আপনি কি রাগ করেছেন?'

'কার উপর?'

'ধরা যাক এই অভাজনেরই উপর।'

'না।'

'তবে কী হয়েছে?'

'কিচ্ছু হয়নি। আপনি বসুন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবা ব'লে গেছেন তিনি আসবার আগে আপনি যেন চ'লে না যান।'

'বাবা আসবার আগে তাঁর কন্যাটিও যেন চ'লে না যান সেই নির্দেশ দিয়ে যাননি তিনি?'

অনসূয়া চোখ তুললো, একটু ঝুঁকলো বিনয়, 'মনে হচ্ছে এখুনি বৃষ্টি নামবে। কিন্তু কেন এই মেঘ? আসিনি ব'লে?' চোখে চোখ রেখে নিজে থেকেই গাঢ় হ'য়ে এলো গলার স্বর। একটা ঢেউয়ের মতো ব'য়ে গেল কয়েকটা সেকেণ্ড। তারপর দু'জনেই চোখ সরিয়ে নিলো পরস্পরের মুখ থেকে।

সাত

আস্তে-আস্তে খ'সে প'ড়লো এক-একটি উজ্জ্বল সোনা-মোড়া দিন। এক-একটি ফুলের নরম পাপড়ি। শীতের ক্ষণিক বেলা বসন্তের দীর্ঘতায় দল মেললো ধীরে-ধীরে, গুটির জঠর থেকে, মসৃণ, শীতল সিল্কের কোমল স্পর্শের মতো। অনসূয়ার জানলার তলা সন্ধ্যামালতীর গন্ধে উতলা হ'লো, অবিনাশবাবুর ফলের বাগানে মুঠো-মুঠো আমের মুকুল ঝ'রে পড়তে লাগলো। ফাল্গুনের বিখ্যাত হাওয়া, সমুদ্র থেকে উঠে এসে ছড়িয়ে পড়লো কুসুমপুরের গাছে-গাছে, ডালে-ডালে, কচি-কচি জামরুল-পাতায়। আট মাস কেটে গেল।

ইতিমধ্যে পরীক্ষা হ'য়ে গেছে অনসূয়ার। বিনয়ের স্কুলের চাকরিও শেষ। এবার তার যাবার পালা। এ-যাওয়া তো যেমন-তেমন যাওয়া নয়, একেবারে সমুদ্রযাত্রা। পুরুৎ ডাকিয়ে, পঞ্জিকা দেখিয়ে, দিনক্ষণ তারিখ ঠিক ক'রে দিদি ছলোছলো চোখে অণুকোটি ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করলেন, জীবনের তো এই একটিই মাত্র অবলম্বন তাঁর, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্বামী-সন্তান সবই তো তাঁর এই এক বিনয়ের মধ্যেই নিহিত, সেই বিনয়কে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার ক'রে কোথায় তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন? তাঁরই গরজ, তাঁরই ইচ্ছেয় ভাই চলেছে সেখানে, থেকে-থেকে তাই কান্না উঠছে বুকের মধ্যে। বিনয় গম্ভীর, বিষণ্ণ। এত কী ভাবছে সে? ভাবছে, অনেক কথাই ভাবছে। তিন বছর কি সোজা সময়? জীবনের কত উত্থান-পতন হ'য়ে যেতে পারে একটি পলকে— আর এ তো তিন-তিনটি বছর। ক'দিন থেকে অনসূয়ার সঙ্গে

তার দেখা হচ্ছে না ভালো ক'রে, ক'দিন থেকে কেন, বলতে গেলে পরীক্ষার পর থেকেই এ-অবস্থা চলেছে। এখন আর পড়াতে হয় না, গেলে ছোটোরা এসে ঘিরে ধরে, অবিনাশবাবু গল্প করেন, মাথায় আঁচল টেনে তাঁর স্ত্রী আসেন এগিয়ে, আর সকলের মাঝখানে কখনো অনসূয়া আসে, কখনো আসে না। বিনয় জল চায়, চা চায়, কোনোদিন মশলা। নিত্যি নতুন উদ্ভব। নম্র নত অনসূয়া বেরিয়ে আসে সে-সব হাতে ক'রে ধীরে-ধীরে, চোখে চোখ পড়ে মুহূর্তের জন্য, একটু দাঁড়ায় বা বসে, কিন্তু কথা বলার অবকাশ হয় না।

যাবার আগের দিন দুপুরের রোদ্দুরে, ধুলো-ভরা আগুন-রাস্তা বেয়ে সে অবিনাশবাবুর ফটকে এসে দাঁড়ালো। অনসূয়া কি জানতো সে-কথা? সে কি এই প্রতীক্ষাতেই ছিলো? জানলা থেকে তৎক্ষণাৎ স'রে গেলো তার মুখ, ত্রস্ত পায়ে সে বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়। বিনয় বললো, 'বাগানে চলো।'

অসহ্য তাপ গাছের ছায়াকেও উত্তপ্ত করেছে, তবু পুকুরধারের লতা-বিতানেই একটু ঠাণ্ডা। জলের ছোটো-ছোটো তরঙ্গে লক্ষ হীরের কুচি, সেই দিকে তাকিয়ে পাকুড়গাছের ঘন ছায়ায় বসলো দু'জনে।

একটু সময় কথা বললো না কেউ। তারপর বিনয় বললো, 'চিঠি লিখো।'

মুখ নিচু করলো অনসূয়া।

'আমি তিন বছর পরে আবার ঠিক ফিরে আসবো তোমার কাছে।'

'তুমি— তুমি কি সত্যিই যাবে?' অনসূয়ার ব্যাকুল গলা যেন কেঁদে উঠলো।

'যাবো না ?'

'কালই ?'

'কালই যেতে হবে।'

'আমার কথা কিছু ভাবলে না ?'

'কী ভাববো ?' একটু হাসলো বিনয়, 'ভালোই থাকবে, ওখানে গিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে আমি চিঠি লিখবো তোমাকে। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো ?'

'ভুলবো ?' অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠলো অনসূয়া। মুখ তুললো, ভেজা-ভেজা গাল, চোখের দীর্ঘ পল্লব ঝাউপাতার মতো ঝাপসা। বিনয় তার হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে রইলো চুপ ক'রে।

'কিছুতেই কি থেকে যেতে পারো না ?' আবার বললো অনসূয়া।

'তুমি তো সবই বোঝো। এই আট মাসও আমার এখানে কাটানো উচিত ছিলো না, এবার আর কী অজুহাতে আমি এখানে প'ড়ে থাকবো, বলো ? আমাকে আর মাস-খানেকের মধ্যেই জাহাজে চড়তে হবে।'

'তবে আমার— আমার কী হবে ?'

'পাগলামি কোরো না— শোনো—'

'তুমি কি কিছু জানো না ?'

'কী জানবো ?'

'জেনেও চ'লে যাচ্ছো ?'

'কী জেনে চ'লে যাচ্ছি, অনসূয়া ?'

'বাবা বলেননি ?'

'কই, না।'

অনসূয়া একটু চুপ ক'রে রইলো, তারপর হঠাৎ ভেঙে পড়লো কান্নায়, 'আমাকে— আমাকে ওঁরা— বিয়ে দেবেন।' থেমে-থেমে, ভেঙে-ভেঙে বেরিয়ে এলো কথা ক'টি।

'বিয়ে!' বিনয়ের বুকের মধ্যে ঐ গরমেও শীতের শিরশিরানি ব'য়ে গেল, 'বিয়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কবে স্থির হ'লো?'

'স্থির হয়েছে কিনা জানিনে, চেষ্টা চলেছে।'

'আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'সুযোগ পাইনি।'

'চিঠি পাঠাও নি কেন?'

'ভেবেছিলাম বাবার কাছে শুনেও বোধ হয় তুমি চুপ ক'রে আছো। হয়তো, হয়তো—'

'হয়তো এই আমার চরিত্র। ক'মাস ধ'রে এই চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছি আমি। কী ক'রে ভাবতে পারলে?'

'রাগ কোরো না, আমাকে উপায় ব'লে দাও।'

'কিন্তু তোমার মা-বাবা কি কিছুই বোঝেন না?'

'কী বুঝবেন?'

'আমি তো লুকোতে কখনো চেষ্টা করিনি। তোমার মা-ও কি লক্ষ্য করেননি?'

'জানি না।'

'তা হ'লে তাঁদের বলবো?'

'বলবে?'

'বলবো না? না-বললে কী ক'রে হবে।'

'ওঁরা যদি রাজি না হন?'

'যদি রাজি না হন!' মুখে-মুখে বললো বিনয়, তারপরেই বললো, 'কেন রাজি হবেন না? না-হবার কী আছে?'

'আমার সঙ্গে যে তোমার জাতের অমিল।'

'ধর্মের তো আর অমিল নেই? তা হ'লে না-হয় একটা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া যেতো,' হাসলো বিনয়। একটু লঘু স্বরে বললো, 'না-হয় ধর্মান্তরই গ্রহণ ক'রে ফেলতাম। কিন্তু সামান্য একটা কায়েৎ-বামুনের বিভেদে আর কী বীরত্ব দেখাতে পারি? কী মহত্ত্ব লুটিয়ে দিতে পারি তোমার পায়ে?'

এক ঝাপটা গরম হাওয়া ছুটে এলো একরাশি ধুলো উড়িয়ে পাতা খসিয়ে। অনসূয়া আস্তে বললো, 'আমার ভয় করে।'

'কিসের ভয়।' অনসূয়ার পিঠ-ভরা লম্বা চুলের একটা গুছি টেনে নিয়ে আঙুলে জড়িয়ে ছেড়ে দিলো বিনয়, 'ভেবেছিলাম বিলেত থেকে ফিরে এসেই এ-ব্যাপারের মীমাংসা করবো; কিন্তু দেখছি সেটা পিছিয়ে এটাই আগে করা দরকার। ভালোই হ'লো।'

'শুধু তো বাবার কথা নয়, আমার কাকাও তো আছেন?'

'কী আশ্চর্য! বিয়ে তো আমি আর তুমিই করবো, ওঁরা যদি এই সামান্য কারণে— কিচ্ছু ভেবো না, কিচ্ছু ভেবো না। আমি আজই বলবো তোমার মা-বাবাকে। যাই এবার, যাওয়ার বদলে বিয়ের

ব্যবস্থা করিগে, কী বলো ?' হঠাৎ খুশিতে ছলছল ক'রে উঠলো বিনয়ের গলা, যেন এ-রকমই একটা উপলক্ষ্য খুঁজছিলো সে। চিন্তার বদলে বরং হালকাই লাগলো মনটা।

বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ি ফিরেও একটা অহেতুক আনন্দ জড়িয়ে রইলো তাকে। বই নিয়ে বসলো একটি, খোলা রইলো পাতা, চোখ চ'লে গেল অনেক, অনেক দূরের আকাশে, যেখানে একটি বিন্দু হ'য়ে একটি শঙ্খচিল পাখা মেলে স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

আট

স্কাউণ্ড্রেল! হঠাৎ হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারের হাতলে একটা ঘুষি মারলেন মিস্টার রায়। ডবল স্প্রিঙের নরম ডিভান থরথরিয়ে উঠলো। উর্দি-আঁটা ঝাড়ন-কাঁধে বেয়ারা ছুটে এলো কাছে। তার ভীত অবনত কালো মাথার ছায়া পড়লো কাচে। হাতের ইঙ্গিতে কলের মতো আবার ফিরে গেল সে। ছি, ছি, এত জয়ী হ'য়ে এখনো এই দুর্বলতা! মিস্টার রায় লজ্জিত হলেন।

এখনো ও-রকম একটা নগণ্য জঘন্য মানুষকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি ব'লে ধিক্কার দিলেন নিজেকে। এ তো একরকমের হেরে যাওয়া, হেরে থাকা। দুঃখ, রাগ, আক্রোশ, অভিমান এ-সব তো তার জন্যেই সঞ্চিত থাকে, যাকে মানুষ মানুষ হিসেবে গণ্য করে। তবে কি মনের গহনে এখনো সেই কীটাণুকীটই বাসা বেঁধে আছে? ছি, এর চেয়ে অগৌরব আর কী আছে? কোনোদিন তো তিনি দুর্বল ছিলেন না, ভীরু ছিলেন না। যদি তা-ই হবে তা হ'লে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমন ধৈর্য, শক্তি, সাহস, পরিশ্রম, আহার, নিদ্রা, মান-সম্মান সমস্ত দিয়ে তিলে-তিলে কি গ'ড়ে তুলতে পারতেন এই সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য? না কি সমস্ত পৃথিবীকে অগ্রাহ্য ক'রে সমাজ সংস্কার সব-কিছুর শিকল ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পারতেন কোনো-এক নিরুদ্দেশ যাত্রায়? কিসের ভয়? কিসের বন্ধন? কোন দুর্বলতা ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলো তাকে? কিন্তু বিকাশ! বিকাশ চৌধুরী! অনসূয়ার সেই পিঠকুঁজো, কালো, ছোটো চোখে সোনার ফ্রেমের মতো

চশমাওলা উকিল-কাকা— তাকে মনে পড়লে আর স্থির থাকতে পারেন না তিনি। না, কোনো ভদ্রতা, সভ্যতা, সংযম কিছুই থাকে না তাঁর। আজও না, এই সুদীর্ঘ ষোলো বছর পরেও না। এতদিন পরেও আবার কাঁচা হ'য়ে ওঠে তাঁর পুরোনো ঘা।

না, অবিনাশবাবুকে— অন্তত আজকে, জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে খুব বেশি দোষ দেন না তিনি। তাঁর জন্যে বরং কষ্টই হয়। লোকটা দুর্বল, ভাইয়ের প্ররোচনায় সে যত বড়ো অপরাধই শেষ পর্যন্ত ক'রে থাকুক না কেন, যত নিষ্ঠুরতা, অন্যায় বা অধর্মই করুক না, তবু তাকে বোঝা যায়। দুর্বল চরিত্রের একটি চরম নমুনা— এর বেশি তো কিছু না? ভালোমানুষেরা সাধারণত এ-ভাবেই নিজের দুঃখ ডেকে আনে। [illegible]রের কথায় বিশ্বাস ক'রে এ-ভাবেই আঠাঁই জলে হাবুডুবু খায়। কিন্তু বিকাশ? বিকাশ কী? ও কি একটা পশুর চেয়েও অধম? একটা জন্তু জানোয়ারের চেয়েও অযোগ্য? তাদেরও একটা প্রতিদান আছে, কৃতজ্ঞতা-বোধ আছে, কিন্তু ওর কী আছে? ঈশ্বর ওকে কোন উপাদানে সৃষ্টি ক'রে পাঠিয়েছিলেন এ-সংসারে?

প্রস্তাব শুনে যদি হকচকিয়েই ওঠেন অবিনাশবাবু, ব্রাহ্মণ হ'য়ে কায়স্থের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার মতো মনের জোর যদি তাঁর না-ই থাকে, তা-ই নিয়ে তাঁকে অভিযোগ করা যায় না। সত্যিই তো, গ্রামে বাস ক'রে, সেই সময়ে সেই সমাজের আইন ভেঙে জাতিচ্যুত হওয়া কি সহজ কথা ছিলো? ছেলেমেয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হ'য়ে বিয়ে করবে, এটাই তো যথেষ্ট কেলেঙ্কারি— তার উপর অসবর্ণ

বিবাহ? সংস্কার কি মানুষ সহজে কাটাতে পারে? হলেনই বা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। তবু তো তার মধ্যেই অনসূয়ার মা ব'লে[illegible]লেন, হোক কায়স্থ, জাত ধুয়ে কি আমি জল খাবো? আমার মেয়েই যদি সুখী না হ'লো তবে আমারই বা সুখ কী? তা ছাড়া কোনো মেয়ে যদি একজনকে ভালোই বাসে, তাকেই স্বামী হিসেবে দেখে, তা হ'লে কী ক'রে সে আরেকজন পুরুষের স্ত্রী হ'তে পারে? সে তো অসম্ভব। তার চাইতে বড়ো অধর্ম আর কী আছে স্ত্রীলোকের জীবনে? মেয়েকে জেরা ক'রে-ক'রে তার সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা তিনি জেনে নিয়েছিলেন। [illegible]বাবু মাথা নেড়েছিলেন।

বিনয়কে তাঁরা ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন, কেবলমাত্র এই একটু জাতের অমিলে এত বড়ো একটা দুঃখের মেঘ নেমে আসবে জীবনে, এটা আঘাত দিয়েছিলো তাঁদের মনে। কিন্তু বিকাশ এলো [illegible] ধ্বজা উড়িয়ে, দণ্ড হাতে নিয়ে তাদের পবিত্র কুল রক্ষা করতে — মেয়ের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে অবহিত করতে তার স্নেহশীল মূর্খ পিতামাতাকে। বিয়ে। বিয়ে দাও অনসূয়াকে পক্ষকালের মধ্যে। যে-ই হোক, যে ক'রেই হোক, যার সঙ্গেই হোক। বামুনের মেয়েরা ঘাটের মড়া ধ'রে বিয়ে করতো কৌলীন্য রক্ষার জন্য। আর এই মেয়ে বিয়ে করবে একটা শূদ্রের বাচ্চাকে? লেখাপড়া! মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে তো এই করলেন তাঁরা। কে না জানে যে স্ত্রীলোককে প্রশ্রয় দিলে শেষে এই দশাই হয়। এই জন্যেই শাস্ত্রে আছে তাদের অসূর্যম্পশ্যা ক'রে রাখা। একটা মেয়ের জীবনের কি এতই মূল্য যার জন্যে এত বড়ো একটা পরিবার নরকে ডুববে? সতেরো বছরের একটা মেয়েকে ঘরে রাখাও যা,

সাপ নিয়ে বিছানায় শোয়াও তা-ই। অবিনাশবাবু স্ত্রীর কথার মতো ভাইয়ের কথায়ও মাথা নাড়লেন। ঠিক! ঠিক!

অতএব দাও বন্ধ ঘরে ঠেলে পাঠিয়ে। ঘুলঘুলি সুদ্ধ বন্ধ ক'রে রাখো যতদিন-না বিয়ে দিয়ে বার করতে পারো ঘর থেকে এত বড়ো আপদকে। বিয়ে করবে না? গলায় কলসি বেঁধে ভাসিয়ে দেবো না আড়িয়ল নদীর জলে! বিনয়ের নাম আর একবার উচ্চারণ ক'রে দেখুক না, সাঁড়াশি দিয়ে জিব টেনে খসিয়ে ফেলি কিনা।

ভয়ে ত্রাসে গলা-বুক শুকিয়ে গেল দিদির। বললেন, 'বিনু, আর না। এবার তুই চ'লে যা।'

'না।'

'হ চেষ্টা করলেও তো আর ওকে তুই বিয়ে করতে পারবিনে।'

বিনয় তাকিয়ে রইলো বাইরে। দিদি হাত রাখলেন পিঠে—'মিছিমিছি নিজেও দুঃখ পাবি, ওর দুঃখও বাড়াবি। বিকাশকে তুই জানিসনে।'

'দেখি না কত দূর পারে!'

'ও লোক লাগিয়ে খুন ক'রে ফেলবে তোকে। লক্ষ্মী ভাই আমার, তুই চ'লে যা।'

'অসম্ভব।'

'আমার কথা শোন, এতে দু'জনেরই ভালো হবে।'

'পাগল! আমি চ'লে গেলে ওরা ওর সর্বনাশ করবে, দিদি। যাকে-তাকে ধ'রে একটা বিয়ে দিয়ে দেবে ওর।'

'দিক। যা খুশি তাই করুক। ওদের মেয়ে, ওদেরই যদি চেতনা না থাকে, হৃদয় না থাকে, তা হ'লে তুই আমি কে। সব ঠিক, তুই রওনা হ'য়ে পড়।'

বিনয় চুপ ক'রে রইলো।

'বিনু, ভালো ক'রে ভেবে ছাখ তুই—'

'না দিদি, এ-সময়ে আমাকে যেতে বোলো না। আমি যেতে পারবো না, পারবো না।' দিদির কোলে মুখ রাখলো সে।

সেটাই কি তিনি ভুল করেছিলেন? আরো অনেক বারের মতো আবারও মিস্টার রায় বিশ্লেষণ করলেন নিজেকে, অনসূয়াকে বিয়ে করতে চাওয়াটাই কি তাঁর বোকামি হয়েছিলো? অন্যায় হয়েছিলো? অপরাধ হয়েছিলো? যৌবনে তো মানুষ কত কিছুই করে, কত প্রেম, কত দৃষ্টি-বিনিময়, কত হাতে হাত ঠেকানো— কিন্তু সেটাকেই অমন একটা গভীরতার পর্যায়ে নিয়ে যায় কে? তিনিই বা কেন নিতে গেলেন? সে কি তাঁর ইচ্ছে? কেউ কি কাউকে ইচ্ছে ক'রে ভালোবাসতে পারে? ভালোবাসা তো জন্মায়! কবে তার কুঁড়ি ধরে মনের অতল গহনে, তারপর একদিন ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে, নিজে থেকে। সে তো কারো ইচ্ছার অধীন না। যে-ফসল আমরা বুনি না, যে-জমি আমরা দেখি না— সেই প্রাণকণিকাটিও তো আমরা উপড়ে ফেলতে পারি না। বুকের ভেতর কোথায় কোন নিভৃতে যে বাসা বেঁধে থাকে। মন কী? মন কাকে বলে? মনকে কে কবে দেখেছে, ধরেছে, ছুঁয়েছে? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। বয়সের পক্ষে সতেজ চেহারা তাঁর ফুটে

উঠলো বুক-খোলা ড্রেসিং গাউনের মসৃণ আচ্ছাদনের ভেতর দিয়ে। আরেকটি সিগারেট ধরালেন। খুব বেশি অভ্যস্ত নন এই নেশায়, নেশাটাই ঠিক তাঁর ধাতস্থ নয়, তবু মনের কোনো অস্থিরতার সঙ্গে তাল রাখবার জন্য এটা চাই-ই তার। হাতের ঘড়িতে নজর করলেন এক পলক। উঠতে হবে আর-একটু পরেই, বারোটায় গিয়ে পৌঁছতে হবে এরোড্রোমে। এবার ভেবেছিলেন ট্রেনে যাবেন, হ'লো না। কত কাল ট্রেনে চড়েন না। ট্রেন প্রায় একটা স্মৃতির মতো। গোটা ভারতবর্ষটা হুশ ক'রে পার হ'য়ে যাবেন পাঁচ ঘণ্টায়, ভাবতেই দুঃখ হচ্ছে। কী দেখতে পাবেন এরোপ্লেনের উঁচু থেকে? নদী নালা পাহাড় কি মাটির ঢিবি, সব সমান।

একটু হাসি ফুটলো, কাল থেকে আজ এখন এই বেলা এগারোটা পর্যন্ত কতবার যে এ-কথাটা মনে ক'রে তিনি কৌতুক বোধ করেছেন তার হিসেব নেই। যারা তখন জীবন পণ ক'রে লড়াই করেছিলো তাঁকে হারিয়ে দিতে, আর কয়েক ঘণ্টা পরে যখন আবার তিনি দাঁড়াবেন গিয়ে তাদের মুখোমুখি, তখন তারা কী বলবে? কী করবে? যে-কোনো একটা লোককে ধ'রে এনে কন্যা সম্প্রদান করার কী কৈফিয়ৎ দেবে সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তানরা? না কি তাড়িয়ে দেবে? আবার ধরিয়ে দেবে পুলিশে?

মস্ত রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছলেন। মনে পড়লো সেই মোটাসোটা ইন্সপেক্টরটিকে। আঃ! কী কান্নাই কেঁদেছিলো অনসূয়া, সেই কান্না-ভেজা মুখ এখনো যেন মনে লেগে আছে। লোকটাকে খুঁজে বের ক'রে বরযাত্রী করলে কেমন হয়? কাকার সঙ্গেও বেশ বন্ধু-সম্মিলন হবে। বর-কনে দেখে মনটা কি খুব খুশি হবে না? সেই কবে

দেখা হয়েছিলো দারজিলিঙের ঝকঝকে 'সানি কটে'র বারান্দায়। কবে? কদ্দিন আগে? ষো-লো বছর? এর মধ্যেই ষোলো বছরের পাতা খসলো সেই সুন্দর সুশ্রী দিনগুলোর উপর। মিস্টার রায় পাৎলা চুলে আঙুল চালালেন। এই তো সেদিনের কথা, এই তো সেদিন কালো কুচকুচে অন্ধকার রাত্রে অনসূয়া আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলো দরজা খুলে, রঙিন কাপড়ে গা মুড়ে। হাতের মুঠোয় তিনি তুলে নিলেন তার নরম ঠাণ্ডা-হ'য়ে-যাওয়া হিম হাত। বললেন, 'ভয় কী!'

অনসূয়া ডাকলো, 'বিনয়!'

'অনু!'

'আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো?'

'মৃত্যুর আগে না।'

সে আরো, আরো কাছে স'রে এলো। ছোট্ট ভীরু পাখি, বুকের উত্তাপে সান্ত্বনা খুঁজলো। প্রত্যেক মুহূর্তে ভয়, প্রতিটি নিশ্বাসে ভয়। গাছ থেকে পাতাটি খসলে সে কেঁপে ওঠে, পাখির পাখা-ঝাপটানিতে জড়িয়ে ধরে নিবিড় হাতে। আর সেই ভয় কি একদিন দু'দিন? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। বাজের তাড়া-খাওয়া ছোট্ট পাখির মতো দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটোছুটি। তবু, তবু কী সুখ! সে তুলনাহীন সুখের কথা ভেবে আজও ভালো লাগলো মিস্টার রায়ের।

ছায়াছবির মতো একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো চোখে।

*　　　*　　　*

ছলছল জলের শব্দ, জলের গন্ধ, শীতের হিম, ঠাণ্ডা হাওয়া। লম্বাটে ছিপ-নৌকোয় উঠে বসলো তারা, দড়ি খুলে দিলো মাঝি।

তিনদিন পরে প্রথম নামলো ডাঙায়, ছোট্ট সরাইখানার টিনের ছাপরায়। হাট বসেছে গাঙের ধারে, ঠোঙায় ক'রে মিষ্টি নিয়ে এলো বিনয়, আনলো পুরি কচুরি শালপাতা। আর? আর শাদা শাঁখা, লাল সিঁদুর।

বাপের বাড়ি থেকে পরনের শাড়িটি ছাড়া আর-কিছুই আনেনি অনসূয়া, হাতের বালা দু'গাছি পর্যন্ত রেখে এসেছে বালিশের তলায়। মাথায় সিঁদুরে ঝলমল ক'রে উঠলো। ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বিয়ে হ'লো তাদের। তারপর কতগুলো দেশ? ঢাকা। মৈমনসিং। গোয়ালন্দ ষ্টীমারের একতলার ডেকে দুঃখী সেজে কলকাতা। পাটনা, জামসেদপুর, পুরী, ওয়াল্টেয়ার—পাগলের মতো টাইম-টেবল হাৎড়ে-হাৎড়ে এলোমেলো ছুটোছুটি।

অবশেষে দারজিলিং। জলাপাহাড়ের উপর মিলিটারি ব্যারাকের আওতায় একলা একটি ছোট্ট নির্জন বাড়ি। সামনে যতদূর চোখ চলে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে অজস্র ফুলের বন্যা। পেছনে গভীর খাদ নিবিড় সবুজে ঢাকা। না, আর ভয় কী! সাত মাস কেটে গেছে, অনসূয়ার পিতৃব্যের উদ্যম কি এখনো নিবে আসেনি? তা ছাড়া এখানে, এই নিরালা বাড়ির ছোট্ট সংসারে, কে আসবে তাদের খুঁজে বার করতে?

একটি থালা, একটি গ্লাশ, একটি বিছানা, একটি স্পিরিট-ল্যাম্প। আর কী? দু'জন মানুষের সংসারে আর কতটুকু লাগে? দুটো শরীর তো একটা হৃদয়েরই দুটো ভাগ। পেরেকে-ঝোলানো আয়না আর চিরুনি। দেয়াল-তাকে দাড়ি কামাবার ব্লেড আর চুলের কাঁটা। পাশাপাশি ধুতি আর শাড়ি, গেঞ্জি আর ব্লাউজ। সকালবেলা অনসূয়ার কত কাজ!

তার কত বড়ো সংসার। সতেরো বছরের মেয়ের মুখে কাঁচা লাবণ্যের ঢল নামে তখন, তাকিয়ে-তাকিয়ে আর চোখ ফেরে না। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপায়, নিচু হ'য়ে ঘর ঝাঁট দেয়, টুকটাক ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে— চব্বিশ বছরের বিনয়ের উদ্বেলিত যুবক-হৃদয় ভালোবাসার ভারে ভারি হ'য়ে ওঠে। পরিষ্কার পেয়ালায় চা নিয়ে আসে সে, সোনালি চায়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে, সঙ্গে ফুল-কাটা প্লেটে কখনো বিস্কুট, কখনো কেক। বিছানায় তোয়ালে পেতে, চারটি পা লেপের তলায় জড়াজড়ি ক'রে অতি মনোরম ব্রেকফাস্ট। বাইরে উজ্জ্বল হ'য়ে রোদ ওঠে, প্রজাপতির মেলা বসে ফুল-বাগানে, বিনয় আলস্য ভেঙে ওঠে তারপর। দাড়ি কামায়, বরফ-কাটা ঠাণ্ডা জলে স্নান করে হুশ-হুশ ক'রে— পোশাক পরে, মাথা আঁচড়ায় অনসূয়ার গায়ে জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে, অনসূয়া চালের সঙ্গে ডাল, ডালের সঙ্গে আলু, আলুর সঙ্গে ডিম আর পেঁয়াজ দিয়ে খিচুড়ি বসিয়ে দেয় স্পিরিট ল্যাম্পে, তারপর শীত-কাতুরে শরীরে লাল টুকটুকে মোটা কোট চাপিয়ে বেড়াতে বেরোয় জঙ্গলে। জানা আছে ঐটুকু স্পিরিট ল্যাম্পের মিটমিটে আগুনে পাক্কা চারটি ঘণ্টা লাগবে চাল ডাল সেদ্ধ হ'তে। এসে নামাবে, নামিয়ে মাখন দিয়ে একথালায় ঢেলে নেবে সবটা।

কবেকার কথা? এই তো সেদিন। এখনো তো মিস্টার রায় সেই উত্তপ্ত সুখস্রোত অনুভব করতে পারেন বুকের মধ্যে। মন কেমন ক'রে ওঠে।

একদিন একটা ছোটোখাটো ভোজের ফর্দ তৈরি হ'লো মাথা খাটিয়ে, হিসেব ক'রে দেখা গেছে এখনো যা টাকা আছে বিনয়ের হাতে তাতে

আরো মাস তিনেক চলবার পক্ষে যথেষ্ট। অনসূয়া বললো, 'আর ভোজের দরকার নেই, চলো এবার এখান থেকে পালাই।'

'পালাবো কী! রেজিস্ট্রিটা ক'রে নি, তারপর না-হয় আর-একবার নির্ভয়ে হানিমূনে বেরুনো যাবে।'

'আমার কেমন ভয় করছে ক'দিন থেকে।'

'ভয়েরও একটা অভ্যেস আছে দেখছি।' নিশ্চিন্ত সুখে বিনয় দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছে অনসূয়াকে, 'কিছু ভয় নেই আর। দু'জন সাক্ষী জোগাড় করেছি, রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দিয়েছি, বিয়েটা হ'য়ে যাওয়াই ভালো।' তবু অনসূয়ার মুখ থেকে ভয়ের ভার নামেনি।

ততদিনে সমস্ত বাংলা দেশের সমস্ত খবরের কাগজে ছবি বেরিয়ে গেছে তাদের। মুখে-মুখে এই চাঞ্চল্যকর খবর নিয়ে কত রকম গুজবই রটনা হয়েছে দিনের পর দিন। কাগজ বিক্রি বেড়ে গেছে— হকারদের হাঁকে-ডাকে। বড়ো অক্ষরে অনসূয়া-হরণের রোমাঞ্চকর কাহিনী প'ড়ে বাপ-মায়েদের মধ্যে সামাল-সামাল রব উঠে গেছে। যুবক যুবতীরা চকিত হয়েছে। রেজিস্ট্রারও কি পড়েননি কাগজ? শোনেননি কিছু?

বোকা! বোকা! বিনয়, আস্ত একটি মূর্খ তুমি। কী বুদ্ধিতে তুমি তোমার নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছিলে রেজিস্ট্রারের কাছে? কী চমৎকার বিয়েই দিতে এলেন তিনি। এত আকাঙ্ক্ষিত বিয়ে, তার মধ্যে কি অনসূয়ার কাকা উপস্থিত না থেকে পারেন? বিয়ের তারিখের নির্দিষ্ট দুপুর কোলাহলে ভ'রে উঠলো। ছোট্ট সানি কট— মাননীয় অতিথিদের পদপাতে সরগরম হ'লো। নতুন কাশ্মীরি কাজ-করা লাল

টুকটুকে শাড়ি পরেছিল অনসূয়া, নিজের হাতে বোনা দামি পশমের ব্লাউজ— পায়ে লাল মখমলের নতুন জুতো। কাল বিনয় গিয়ে কিনে এনেছিলো সব। আর বিনয় ধুতি পরেছে লম্বা কোঁচার, সিল্কের পাঞ্জাবি, কাজ-করা শাদা শাল, নতুন স্যাণ্ডেল পায়ে, ফুলবাবু।

'আসুন, আসুন।'

দরজার টোকা শুনে সাগ্রহে এগিয়ে গেল সে। অনসূয়া বিছানার টান-করা বেডকভার আর-একটু টান করলো— তাড়াতাড়ি খাবার ঠিক করতে গেল ভাড়া-করা প্লেটে।

কিন্তু এ কী! দরজা খুলে আঁৎকে উঠলো বিনয় আর আকর্ণ হাসিতে ফেটে পড়লো বিকাশ।

'এলাম, তোমাদের বিয়ে দেখতে এলাম।' গলার স্বরে চকিতে পেছন ফিরে তাকালো অনসূয়া, তারপরেই একটা আতঙ্কিত আওয়াজ ক'রে ছুটলো সে বাথরুমের দরজা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকের খাদে, যেখানে নিবিড় সবুজ বুক পেতে আছে সমস্ত শীতলতা নিয়ে। লাফিয়ে গিয়ে চুলের মুঠি ধরলো বিকাশ— 'দেখি, দেখি, শ্রীমতীকে দেখি একবার—' বিনয় বাঘের থাবায় সে-হাত মুচড়ে দিলো। মাত্র একটা পলক।

'লাগাও, লাগাও হাতকড়া, লাগাও, হারামজাদা বদমাস!' বিকাশের চীৎকারে পাহাড় প্রতিধ্বনিত হ'লো, 'ভদ্রলোকের মেয়ে ফুসলে বার ক'রে আনার মজা এক্ষুনি টের পাবি তুই!'

উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো অনসূয়া— 'না, না, না, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, কেউ আমাকে নিয়ে আসেনি। তোমরা ছাড়ো, ছাড়ো ওঁকে, ছেড়ে দাও।' —তার চুল খুলে গেল, শাড়ি খ'সে গেল, আঁচড়ে-

কামড়ে মুহূর্তে পাগল ক'রে দিলো সকলকে। রেজিস্ট্রারের মুখ-চোখ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিলো, 'ওরে, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর, এই জন্যেই তুই রোজ এসে-এসে চা খেতিস, বৌমা ডাকতিস, নজরে রাখতিস এই দিনটার জন্যে। আর তুমি? তুমি আমার পরম হিতৈষী কাকা! আমার বাবার খেয়ে আমার বাবাকে ঠকিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছো।' এক টানে তার চশমা ফেলে দিলো, মারতে উদ্যত হাতে প্রচণ্ড এক কামড় বসিয়ে রক্তাক্ত ক'রে দিলো।

কে রোখে তাকে? একা সে একশো। বোধ নেই, চৈতন্য নেই, লজ্জা নেই, তারপর এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো শুকনো লতার মতো।

নয়

তারপর? তারপর কী?

আশ্চর্য! তারপর সেই মেয়েই নাকি একদিন ছেড়ে গেল তাকে। কেন গেল? কেমন ক'রে পারলো? কে তাকে অমন ক'রে ভুলিয়ে দিলো সব কথা? কে? একটা ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় সমস্ত হৃদয় মথিত হ'য়ে উঠলো আজ মিস্টার রায়ের। অনসূয়া! তুমি কি জানো তারপর কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত অপরিসীম লজ্জা অপমানের দরজা আমাকে ডিঙোতে হয়েছে তোমার ঐ সুন্দর লাবণ্যমাখা মুখের সামান্য কয়েকটি কথার জন্য? নেংটি আর কোর্তা প'রে প্রচণ্ড রোদে জলতে-জলতে আর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে জেলের চোর বদমাস আর খুনিদের সঙ্গে— যখন পাথর ভেঙে হাতে ফোস্কা পড়েছে, মাটি কুপিয়ে বুকের পাঁজরা খ'সে এসেছে— তখন আমার কী মনে হয়েছে তা কি তুমি জানো? সেই যন্ত্রণা আমার কাকে মনে ক'রে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে? তুমি জানো? তুমি কি ভুলেও কোনোদিন ভেবেছো সেই কথা? ভুলেও আর আমাকে ভেবেছো তুমি? কিন্তু আমি কেন পারিনি? কেন পারিনি? হঠাৎ মিস্টার রায়ের চোখে লাল ছিটে লাগলো। নিশ্বাস ঘন হ'লো।

আর তাঁর দিদি! হতভাগিনী দিদি! ভাইকে মানুষ ক'রে কী সুখই হ'লো তাঁর! তাঁর গায়েরই সমস্ত সোনার মূল্য দিয়ে যাকে একদিন রক্ষা করতে চেয়েছিলো বিনয়, সেই মেয়েই শেষে একদিন সর্বনাশ করলো তাদের। 'বালিকা অপহরণের আসামি'— কে প্রমাণ করলো সে-কথা? অনসূয়া। অনসূয়া। হঠাৎ একটা ক্ষমাহীন আক্রোশে দপ ক'রে জ'লে উঠলো বুকটা।

ভাইয়ের অপরাধে এবং অনুপস্থিতিতে দিদিকেও কি কম নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে ঐ গ্রামে? এমন কি পুলিশের হাঙ্গামা থেকেও রেহাই পাননি তিনি। দিদি যখন আর গ্রামে টিঁকতে না-পেরে কলকাতা এসে বাসা নিলেন, খবরটা জেনে দিদির সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিলো বিনয়। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে, চেহারা সুন্দর, আর যত বদমাসই হোক, মানুষটা তো বিদ্বান কম নয়— কর্তৃপক্ষ একটু নেকনজরে দেখতেন তাকে; দয়া ক'রে অনুমতি দিলেন তক্ষুনি। কিন্তু দিদি বলেছিলেন, 'আমার ভাই? আমার ভাইয়ের তো কবে মৃত্যু হয়েছে।' কত দুঃখে বলেছিলেন এ-কথা বিনয় তা জানে। তাই অভিমান করতে পারেনি। জেলখানার কুঠুরির দেয়াল মাত্র মুহূর্তের জন্যেই ঝাপসা হয়েছিলো তার কাছে। তার বেশি না। তারপর একদিন খবর এলো তিনি মারা গেছেন। বোবা চোখে দেওয়ানজির চিঠির সেই খবরটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সেই প্রথম বিনয় ভেঙে পড়েছিলো কান্নায়। আজ মনে হয়, দিদির কথাই তাঁর শোনা উচিত ছিলো প্রথম থেকে। ভুল করেছিলেন তিনি, ভুল, মহা ভুল— যে-ভুল আর জীবনে শোধরানো যাবে না। সেদিনের বিনয়কে ভেবে আজকের গণ্যমান্য বিনয় রায় জোরে-জোরে নিশ্বাস নিলেন।

দশ

বর্ষা নামলো প্রবল হ'য়ে, খবর পাওয়া গেল মেয়াদ ফুরিয়েছে বিনয়ের। নর্দমার কোণটুকুর একফালি জমিতে কবে কেমন ক'রে বীজ পড়েছিলো, কুণ্ডলতার ঘন সবুজ ঝিরিঝিরি পাতার ফাঁকে-ফাঁকে মখমল-লাল ফুল ফুটেছে অজস্র হ'য়ে। খাটুনি-ঘরের ছোট্ট ঘুলঘুলির পাশে কদমফুলের গাছ নেয়ে-ধুয়ে ঝকঝকে। কয়েদিরা উঠেছে অন্ধকার থাকতে। জেল-কোড অনুসারে আজ তাদের ছুটি। আজ তারা কাপড় কাচবে। ভাটি বসেছে বটতলায়। কোমরে গামছা জড়িয়ে তারা প্যাণ্ট আর কুর্তা ফেলে দিচ্ছে ভাটিতে। দু'টি ক'রে প্যাণ্ট আছে কিন্তু কুর্তা একটি। সেটি তোলা থাকে ধোয়া-পাকলা হ'য়ে, বড়ো সাহেব এলে বার করা হয়, ফিটফাট কয়েদি দেখে তিনি খুশি হন।

জেলের সীমাবদ্ধ জায়গাটুকুর মধ্যেই এপাশ-ওপাশ ঘুরে বেড়ালো সে। সব চেনা হ'য়ে গেছে, মায়া ব'সে গেছে। জীবনের নতুন অঙ্কুর উদ্গত হ'য়ে উঠেছিলো প্রায়। অসুখ করেছিলো ক'দিন আগে, অল্পেতেই ভেঙে আসে শরীর। সঙ্গীরা— যারা খুনী, যারা তার মতোই মেয়ে ফুসলে আনার অপরাধে অপরাধী, পাশবিক অত্যাচারের জন্য যাদের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, সবাই আজ মলিন। তারা বারে-বারে কাছে আসছে, ফিরে যাচ্ছে। ছোটো রং-ধরা নিজেদের কারো অতি আদরের কুড়িয়ে-পাওয়া কিংবা জমাদারের কাছে ঘেঙিয়ে-নেওয়া বিস্কুটের টিনে সাজিয়ে দিচ্ছে ভাঙা চিরুনিটা, আয়নাটা, আরো কী জানি কী। বলছে, 'যাও, বাইরে যাও। আঃ, কত কাল আসমান দেখি না, জমিনে দাঁড়িয়ে

নিশ্বাস টানি না, খেতের আলে আমনের গন্ধে অস্থির হ'য়ে হাঁটি না। তবু যে তুমি যাবে, তুমি দেখবে, তাতেও কত আহ্লাদ হয় মনে। ঠিকানা নাও, ঠিকানা নাও। একবার আমার বছিরকে চোখে দেখে খবর দিয়ো। একবার দেখো আমার দুষমন ভাইটা জোর ক'রে নিকা করলো কিনা আমার বউটাকে। এই কোরো, ঐ কোরো, চিঠি লিখো, ভুলে যেয়ো না।' কত শত ব্যাকুল মিনতি। বকুনি খেয়েও ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এলো তারা। বন্ধুকে দুই হাতের আলিঙ্গনে চেপে ধরলো বুকের মধ্যে, কত কথা লেখা হ'য়ে গেল। ভালোবাসার উষ্ণ স্রোত। নোংরা হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে বিদায় দিলো চিরদিনের মতো। গেট বন্ধ হ'য়ে গেল।

তারপর রাস্তায় এসে দাঁড়ালো বিনয়, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আবার জেল-ফটকের মধ্যেই তাকিয়েছিলো। এখন কোথায় যাবে সে? কে আছে তার? কী করবে এখন? আজ মনে হ'লো জেলের খুনি আসামিরা মন্দ ছিলো কি বন্ধু-হিসেবে? জেলখানাই বা কী এমন খারাপ ছিলো? এই তো মন-কেমন করছে তাদের জন্য। আর কবে দেখবো তাদের? ফটকের বাইরে, মস্ত বড়ো তেঁতুলগাছের ছায়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এ-কথাই তার মনে হ'লো। পা খালি, পরনে হাফ-প্যাণ্ট, মুখশ্রী কেমন? জানে না সে। এই ক'বছরে একবারের জন্যও মুখ দেখতে ইচ্ছে করেনি তার। ঢোঁক গিলে ধীরে-ধীরে পা ফেললো রাস্তায়, হঠাৎ দূরে একজন বন্ধুকে দেখে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলো পদক্ষেপ। বন্ধু তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ হাঁ ক'রে রইলো, তারপরেই মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল তাকে ছাড়িয়ে। অল্প একটু সময়ের জন্য নিশ্চল

হ'য়ে পড়েছিলো সে, তারপর ঠোঁট বেঁকেছিলো হাসির রেখায়। মানুষ মানুষের প্রতি যে কত নিষ্ঠুর, কত হিংস্র, তা সে-সময়ে খুব ভালো ক'রেই জেনেছিলো। আজকের দিনে সে-সব প্রশ্ন অবান্তর, সে-সব দিন মুছেও গেছে জীবন থেকে— তবু, তবু তার জ্বালা আজও কেন দহন করে?

কিন্তু না— আর না, আজকের এই সুন্দর রোদে-ভরা, উজ্জ্বল, মধুর দিনে সকলকে মনে-মনে ক্ষমা করলেন মিস্টার রায়। আজ তো আর তিনি চব্বিশ বছর বয়সের 'নারীহরণ' মামলার ঘৃণিত দুশ্চরিত্র নিঃসম্বল আসামি নন? আজ তিনি একজন প্রৌঢ়, সম্ভ্রান্ত, বহুমান্য ভদ্রলোক। মালাবার পাহাড়ে তাঁর চমৎকার বাড়ি। বিশেষজ্ঞদের নিপুণ হাতে সাজানো ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, বাগান, লনের এই সবুজ ঘাস, আর বছর ভ'রে ফুল। তাঁর কোনটা আজ ঈর্ষাযোগ্য নয়? কোনটার দিকে না মানুষ আজ তাকিয়ে থাকতে পারে? বোম্বাইয়ের মান্য বরেণ্যরা কে না আজ তার বন্ধুতার জন্য লালায়িত? তবে? তবে আর কেন এই রাগ? সত্যিই যার উপরে তাঁর রাগ করা উচিত তাকেই যদি ক্ষমা করতে পারলেন, তবে আর অন্যেরা! সমস্ত দুঃখের উৎস কি তাঁর অনসূয়াই নয়?

সমুদ্রের খালাসি হ'য়ে ভেসেছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে। সম্বলের মধ্যে একটিমাত্র জিনের প্যাণ্ট আর একটি শার্ট! আর কী? মা-র গলার একছড়া হার পেয়েছিলেন, গলিয়ে-গলিয়ে সেই হারের সামান্য তলানি। কত দেশ, কত মানুষ, কত বিচিত্র চরিত্র, ছলা, কলা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মোট মাথায় নিয়ে কুলিগিরি, এই বন্দর থেকে সেই বন্দরে প'ড়ে থাকা, অবশেষে আমেরিকা। সোনার খনি। আজ ভাবলে বীরত্বের বৈকি!

কিন্তু তখন? সহায়হীন, সম্বলহীন একজন কালো মানুষের পক্ষে তখন কি খুব সুখের হয়েছিলো সে-সব ঐশ্বর্যের দেশের জলহাওয়া?

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। অনাহার, অনিদ্রা, এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত, যতক্ষণ না দেহ অবশ হ'য়ে এলিয়ে এসেছে ততক্ষণ কি এক পলকের জন্যও থেমেছেন? সে কি একদিন দু'দিন? একমাস দু'মাস? বছরের পর বছর একই ভাবে, একই কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কেটে গেছে, রাত কেটে গেছে, আবার সকাল হয়েছে, আবার দিন আর রাত। আর যখনই অবসর হয়েছে নিজের নিভৃত ঘরের অন্ধকারে, তখনি মনে পড়েছে এই অনসূয়াকে। ব্যর্থ হ'য়ে গেছে সব। মুহূর্তে একটা তিক্ত স্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেহ-মনে। বুকের মধ্যে যেন জ্বালা ক'রে উঠেছে। কী শাস্তি, কী শাস্তি তিনি দেবেন তাকে, কী শাস্তি তিনি দিতে পারেন এই মেয়েকে?

অথচ এখন আর তার উপর একটুও রাগ নেই! কবে যে সে-জ্বালা মুছে গেছে অন্তর থেকে, কবে যে অনসূয়াই মুছে গেছে তাঁর জীবন থেকে, কিছুই আজ মনে পড়ে না। দশ বছরের মধ্যে কখনো কি তিনি ভেবেছেন সে-কথা? অনসূয়ার চেহারা পর্যন্ত আজ ঝাপসা তাঁর আছে। সে কেমন ছিলো? কত গভীর ছিলো তার অপরাধ? কী জানি।

এই তো সবে একটুখানি গুছিয়ে বসেছেন, যন্ত্র আজ চলে তাঁর ইঙ্গিতে, দৈহিক পরিশ্রমে আর নয়। দীর্ঘ জীবন পেরিয়ে জীবনের কুসুমিত মুহূর্তের সবখানি উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে অর্জন করেছেন এই সামান্য অবকাশ, সামান্যতম শান্তি। আবার এলো অনসূয়া। কেন এলো? আর এলো যখন, তখন তো কই কোনো প্রতিশোধই নিতে

পারলেন না। বরং কোথায় যেন বেদনার একটা ছলছলানি, যেন একটা হারিয়ে-যাওয়া সুখকে আবার অনুভব করলেন তিনি মনের মধ্যে। তবে কি মনের অগোচরে এতদিন লুকিয়ে ছিলো সে-ই? সমস্ত জীবন ভ'রে কি তবে ঐ একটি মানুষের কাছেই তাঁর হৃদয় আবদ্ধ হ'য়ে আছে? এখনো, এখনো কি তিনি তাকেই ভালোবাসছেন সমস্ত সত্তা দিয়ে? না কি এই তার যোগ্য প্রতিশোধ? না, না, প্রতিশোধ কেন? অনসূয়ার কাছে কি কোনো ঋণ নেই তাঁর? যে-মেয়ে একদিন একমাত্র তাঁর জন্যই সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো রাস্তায়, তাকে তিনি অস্বীকার করবেন কেমন ক'রে? কিসের জোরে? সেটা কি মনুষ্যত্ব? অত বড়ো একটা মিথ্যার মুখোমুখি হয়তো সে দাঁড়িয়েছিলো, কিন্তু তবু— তবুও সে ক্ষমার যোগ্য। এই যে ষোলো বছর ধ'রে এমন একটা কলঙ্কের বোঝা বহন করলো অনসূয়া, তাতেই কি তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? তা ছাড়া সেই দুঃখ ভোগের জন্য দায়ী তো তিনিই।

মনে-মনে অনুতপ্ত হলেন মিস্টার রায়। সত্যি, এর অনেক আগেই অনসূয়াকে তাঁর খোঁজ করা উচিত ছিলো। মূঢ় গুরুজন! অদম্য অধিকারবোধে কত ক্ষতিই তোমরা করো সন্তানের। নিজেদের অহংকার পরিতৃপ্তির জন্য তোমরা তাদের বলি দিতেও দ্বিধাহীন। তা নইলে কাগজে আর অবিনাশ চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন বেরোয় মেয়ের বিয়ের জন্য? 'বয়স্থা দুঃখী কন্যার জন্য যে-কোনো জাতের, যে-কোনো গোত্রের, যে-কোনো রকম একজন দয়াবান পাত্র চাই।'

মিস্টার রায় হাসলেন। হায় রে পিতা! এই মেয়েকে একদিন তুমি কত ভালোই না বেসেছো। এই মেয়ের কথা বলতে তোমার

পিতৃ-হৃদয় কতই না উদ্বেলিত হয়েছে। আর আজ? আজ তোমার বয়স্থা দুঃখী কন্যার জন্য সেই মমত্ববোধের কতটুকু আর অবশিষ্ট আছে? কতটুকু সহানুভূতি? আজ তাকে একটা 'যে-কোনো' স্তূপে সমাধি দিতে ব্যস্ত। বোম্বের কে না কে এক ব্যবসায়ী— মিস্টার রায়, এইটুকু পরিচয়ই আজ মেয়ের পাত্র হিসেবে যথেষ্ট। তার পুরো নামটাতেও কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। কী তোমরা? কী? নিজের ঘাড় থেকে এখন বোঝা নামলেই শান্তি, না? তবে না একদিন সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবে আমারই কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে? যে-মানুষ তাকে আত্মার অধিক ভালোবাসতো, যে-মানুষ সমস্ত জীবন বিকিয়ে দিতো তোমার মেয়ের সুখের জন্য! আজ কী চমৎকার পরিচয়ই দিচ্ছ পিতৃস্নেহের।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার রায়। উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঘুম পাচ্ছে ছেলেমানুষের মতো। নাঃ, সময় হ'লো, যা হোক খেয়ে নিতে হয় কিছু। চটিটা পায়ে গলিয়ে ধীরে-ধীরে তিনি লম্বা বারান্দা পার হলেন। ঘরে-ঘরে নতুন বার্নিশের গন্ধ। ঘরে-ঘরে ঝকঝক করছে নতুন জিনিস। দেয়ালে আবার রং লাগিয়েছেন তিনি, পালিশ দরজা আবার পালিশ করিয়েছেন। একবার শোবার ঘরে এলেন। তাকালেন বিচক্ষণের মতো। হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক হয়েছে। একক শয্যা যুগল হয়েছে এখানে। ছোটো ওয়ার্ডরোবের বদলে মস্ত ভারি আয়নাওলা বর্মা টিকের মেয়ে-আলমারি এসেছে ঘরে, পুব-দক্ষিণ কোণে লম্বা আয়নার চকচকে ড্রেসিং-টেবিল। মস্ত বিছানার উপর কাশ্মীরি কাজ-করা বহুমূল্য বেড-কভারটির দিকে তাকিয়ে ক্ষণকের

জন্য একটি কালো চুলের, কালো চোখের মেয়েকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। মন্থর পা ফেলে নতুন বোখারা কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ভাবলেন, সে কি আসবে? সত্যিই আসবে? সে কি সত্যিই ঘুরে বেড়াবে এই বাড়িতে, এই ঘরে-ঘরে, এই সিঁড়িতে, এই বাগানে, বাগানের লনে। আজ তিন দিন ধ'রে মিস্টার রায় কি পাগলের মতো তার আয়োজনেই আত্মহারা ছিলেন?

স্মৃতি! শুধু তো স্মৃতিতেই আজ পর্যবসিত সব। তবু কী মধুর! কী মধুর সেই স্মৃতি! কী আশ্চর্য! অনসূয়ার স্মৃতিতেও এত সুখ?

মা-বাবা

এক

অনসূয়ার বিয়ে, তার আবার আয়োজন। ঐ এক ফোঁটা উঠোনকেই ঝাঁট-পাট দিয়ে, আলপনা কেটে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'লো। অবিনাশবাবু ইচ্ছে ক'রেই কাউকে ডাকেননি। মনের পরতে-পরতে তাঁর কালো মেঘের ভার। তাঁরও কি আজ কোনো কথা মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে না এক অশ্রুমুখী তরুণীর মর্মান্তিক কান্না? মনে পড়ছে না নিজের কোনো অন্যায়, অবিচার? শুধু তাঁর জন্য, তাঁর জন্যেই তো আজ এই তেত্রিশ বছরের হতভাগ্য কলঙ্কিনী মেয়েটিকে এমন ক'রে ঠেলে ফেলে দিতে হচ্ছে পুরুষ-জাতীয় কোনো-এক মনুষ্যের হাতে, বিবাহ নামক কোনো-এক অনুষ্ঠানের প্রবঞ্চনায়।

সকালবেলা একবারের জন্য বিকাশ এসে দাঁড়িয়েছিলো উঠোনে। অধিবাসের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কঠিন হ'য়ে গেল। আগেকার দিন হ'লে অবিনাশবাবু লক্ষ্য করতেন না, কিন্তু আজ, আজকের দিনে তাঁর চোখে আর কিছুই এড়ায় না। তাঁর ভাই, প্রাণতুল্য প্রাণাধিক ভাই, এই ভাইয়ের জন্যই একদিন দেশগাঁয়ের মমতা ছেড়ে চাকরি নিয়েছিলেন দূর দেশে, বোর্ডিঙের খরচ জোগাতে স্ত্রীর গয়না বিক্রি করেছিলেন অক্লেশে। বুকের রক্ত জল ক'রে পিতৃস্নেহে মানুষ করেছিলেন এই ভাইকে। এই বিকাশকে! মুখের শিথিল পেশীতে একটু কম্পন উঠলো। একটু

হাসলেন বোধ হয়। ছেঁড়া চটিতে পা গলিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন, ফুটপাতে।

আকাশ ভ'রে অন্ধকার নেমে এলো। নিষ্প্রভ চোখে তাকালেন উপর দিকে, হৃদয় মথিত ক'রে একটি নিশ্বাস পড়লো। আশ্চর্য! তবু এখনো, তাঁর কত স্নেহ সেই ভাইয়ের জন্য। দৌড়ে গিয়ে হাতে-পায়ে ধ'রে তবু আজ তিনি নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছেন তাকে। কী দরকার ছিলো? সে যে খুশি হবে না, তা তো তিনি জানেন। কিন্তু কেন এই আক্রোশ? সাধ মেটাবার আর কী বাকি রেখেছে সে? অবিনাশ পথে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর স্ত্রী আধপেটা খেয়ে ধুঁকছেন, সন্তানেরা যে যার পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর-বেড়ালের মতো, আর অনসূয়া, হতভাগিনী অনসূয়া— তাঁর অতি আদরের অনু, অনাই, অণুকোটি— হায় রে—

'আমার একটা প্রার্থনা আছে।'

বিকেলে চা খেয়ে সবে এসে বসেছেন বকুলতলায়, অনসূয়া বসেছে তার মা-র পিঠ ঘেঁষে, আস্তে সে এসে বসলো কাছে। কে? কে সে? তাকে কি ভুলে গেছেন তিনি? ভুলতে পেরেছেন তাঁর মেয়ের সেই সুবেশ সুশ্রী পাণিপ্রার্থীটিকে? বিদ্যায় বুদ্ধিতে শালীনতায় শিক্ষায় যে-মানুষটি একান্তভাবেই তাঁর কন্যার যোগ্য ছিলো?

'তোমার আবার কী প্রার্থনা?' প্রসন্ন অভ্যর্থনায় তিনি অধীর হ'য়ে উঠলেন।

'আমি অনসূয়াকে বিয়ে করতে চাই।'

পরিষ্কার স্পষ্ট গলা, এতটুকু সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই। তাঁকে

উঠলেন অবিনাশবাবু। 'বিয়ে!' আমার মেয়েকে? ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের বিয়ে। সে যে একটা ভারি অনাচার! বিনয় কি পাগল? বোকা? সে কি জানে না সমাজের আইন-কানুন? পাঁচজনের মতামত আছে না? আর পাঁচজন দিয়ে করবেন কী। তিনি নিজেই কি এই চিরাচরিত নিয়মকে লঙ্ঘন করবেন এমন শক্তি রাখেন মনের মধ্যে? বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষে কার ঘরে এমন একটা বিয়ে হয়েছে? অসম্ভব! চারদিকে তাকিয়ে, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, লতা-পাতা যে যেখানে আছে প্রত্যেকের নাম মনে করলেন— কই? কেউ তো নিজের কুল ত্যাগ ক'রে এমন একটা বিজাতীয় কর্ম করেনি তাদের সমাজে! তবে তিনি কেমন ক'রে করবেন? এই তো দুই পুরুষ আগেও তাঁরা গঙ্গাস্রোত কুলীন ছিলেন, আর মাত্র দুই পুরুষ পরেই এতখানি নিচে নেমে শূদ্রের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন? গ্রামে বাস করবেন কেমন ক'রে? কেমন ক'রে মুখ দেখাবেন সমাজে? কেউ যে জলস্পর্শ করবে না তা হ'লে তাঁদের ঘরে! জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হ'য়ে থাকতে হবে বাকি জীবন। সংস্কার! সংস্কার! কত কালের কত পুরুষের সংস্কারে ধাক্কা লেগেছিলো তাঁর, তা নইলে অমন পাত্র কি কেউ মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেয়?

একবাক্যে মাথা নাড়লেন— অসম্ভব! অসম্ভব! এরকম একটা কাণ্ড হ'তেই পারে না এই দেশে এই সমাজে ব'সে।

বিনয় নির্বোধ। তবু সে ব'সে ছিলো চুপ ক'রে, তবু সে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো মানুষের হৃদয়ের কথা, শিক্ষার কথা, মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের গভীরতার কথা। আর তাঁর মেয়ে, তাঁর অনসূয়া, অনেক

রাত্রিতে ছোট্ট শিশুর মতো তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো। চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলো বাবার কঠিন বুক। শেষে উপায়ান্তর না-দেখে তিনি টেলিগ্রাম করেছিলেন ভাইকে। তার মতামতের উপরই নির্ভর করেছিলেন। যদি তার সম্মতি পান, জোর পান। তার সহায়তা পেলে হয়তো সব-কিছুরই রং বদলে যেতো জীবনের; হয়তো সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি পেতেন তিনি. কিন্তু ভাই, তাঁর পরম স্নেহাস্পদ, পরম সুহৃৎ, পরম বান্ধব, সে কি তক্ষুনি ছুটে এসে অত বড়ো একটা সর্বনাশকে না-ঠেকিয়ে পারে?

আশ্চর্য হ'য়ে ভাবলেন অবিনাশবাবু, কোনো বিষয়েই তো কোনোদিন মনের মধ্যে তেমন কোনো জোরালো সংস্কার অনুভব করেননি তিনি, যার-তার বাড়িতে যার-তার হাতে খেয়ে এসে শৈশবে কতদিন মা ঠাকুমার কাছে কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। কতদিন কত কারণে স্নান করতে হয়েছে অসময়ে।

জাতিভেদের এমন একটি কঠোর নিয়মকে হৃদয়ঙ্গমই করতে পারেন নি জীবনে, হঠাৎ ঐ বিয়ের ব্যাপারে তিনি কেন অমন থমকে গেলেন? কেন কিছুতেই, কোনোমতেই সায় দিতে পারলেন না মনে-মনে। ভয়? লজ্জা? সমাজ? কী?. না কি বিকাশের প্রতি তাঁর অসামান্য মুগ্ধতাই তাঁর সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধিকে বোবা ক'রে দিয়েছিলো? সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছিলো?

কী জন্যে অমন বাঁদর-নাচ নাচলেন, নিজের গালে নিজেই চুনকালি মাখলেন, সমস্ত পরিবারের মুখে থুতু ছিটোলেন। কেন? আজকে আর ভেবে পান না। নিজের সন্তানের চেয়েও কি তবে তখন তিনি ভাইকেই মর্যাদা দিতেন বেশি?

কী আশ্চর্য !

বিকাশ এসেছে, আর ভয় কী ! বিকাশ শাসন করছে, তার উপর আর কথা কী ! বি.এল.-পাশ উকিলবুদ্ধি মানুষ মাথা গলিয়েছে এতে, না, আর টুঁ শব্দটি না। তার বুদ্ধির কাছে কার বুদ্ধি এ-বাড়িতে ? তার বিদ্যার কাছে কার বিদ্যা ? এ-বাড়িতে এমন আর কে আছে, বিকাশের জন্য যাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে বর্জন করতে না পারেন ? অনসূয়া কেঁদে-কেঁদে বললো, 'বাবা, আর তো পারি না।'

তিনি বললেন, 'কাকাকে বলো। আমি এখানে কেউ না।'

'তুমি কেউ না ? তুমিই তো সব। তুমি আমাকে বাঁচাও। কাকার যন্ত্রণা আর আমি সইতে পারি না।'

'সেটাই তোমার বাঁচবার রাস্তা।'

অনসূয়ার মা বললেন, 'বিকাশ বাড়াবাড়ি করছে, তুমি কেন কিছু বলো না ?'

'বলবার মুখ রেখেছে তোমার মেয়ে ? বাড়াবাড়ি তো সে-ও কিছু কম করছে না ?'

'না, ও কিছু করছে না, কিছু বলছে না, ওকে থাকতে দাও ওর মনে ওর কাজ নিয়ে চুপচাপ। চুলের ঝুঁটি ধ'রে কার সঙ্গে তোমরা ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছো ? কেন তোমাদের এই নিষ্ঠুরতা ? তুমি তো বাপ।'

বাপ ! ভাইয়ের বুদ্ধিপরবশ হ'য়ে তখন তাঁর পিতৃত্বকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আড়িয়ল নদীর স্রোতে। বাপ ছিলেন তিনি ? শয়তান। শয়তান। শয়তানে চালাচ্ছিল তখন তাঁকে। তখন তাঁর জেদ চেপে গিয়েছিলো মাথায়। তিনি বুঝেছিলেন অনসূয়ার মতো

অসচ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী, নষ্ট মেয়ে দু'জন জন্মায় না এই সংসারে। বিকাশ ধীরে-ধীরে তিলে-তিলে এই বিষবৃক্ষের বীজ বুনে দিয়েছিলো তাঁর মনে। সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে মহীরুহ হ'লো। যে-মেয়েকে বুক থেকে নামাতে কষ্ট হ'য়েছে সেই মেয়ের উপর ঘৃণায়, বিদ্বেষে, আক্রোশে বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে হৃদয়। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! যে-মেয়ে ধর্ম নিলো, মান নিলো, সম্ভ্রম নিলো, জাত নিলো, তার উপরে প্রতিশোধ!

সেই ধর্ম, সেই জাত, সেই সম্ভ্রম খুব ভালোভাবেই ফিরিয়ে দিলো বিকাশ। একেবারে ভিটেমাটি সুদ্ধু উপড়ে দিয়ে।

এই তো, আজকের আগেও তো এমন ক'রে ভাবেননি তিনি বিকাশকে, এমন বুকফাটা আর্তনাদ নিয়ে দেখেননি মেয়েকে। মেয়েকে তো শেষ পর্যন্তও তিনি ঘৃণা করেছেন, অবহেলা করেছেন, দুঃখ দিয়েছেন, মুখের দিকে তাকাতে পারেননি ভালো ক'রে। আজ, আজ কতকাল পরে পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলেন তাকে; ভাঙা গালের ছোট্ট টোলে, ঠোঁটের বাঁকায়, ছলোছলো চোখের ঘন পল্লবে ঝিলিক দিয়ে উঠলো বিদ্যুৎ। স্মৃতির রিদ্যুৎ, বুকের সব পাঁজর যেন খসিয়ে দিলো। তবে এতদিন এ-সব কোথায় ছিলো? কোথায় ছিলো? কে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলো এই দুরন্ত ভালোবাসা থেকে। আর যদি ঘুমিয়েই ছিলাম, তবে, তবে এই বিসর্জনের মুহূর্তে কেন ভেঙে গেল সেই ঘুম? কেন? কেন? বুকের উপর দুই হাত চেপে দরজার গোড়াতেই ফুটপাতের শানে ব'সে পড়লেন তিনি।

দুই

একজন ঠাকুর আনা হয়েছে রান্নার জন্য। সকালবেলা অবিনাশবাবুই নিয়ে এসেছেন খুঁজে-খুঁজে। যাই হোক, দু'একজন প্রতিবেশী তো আছে, বরযাত্রী তো আসবে কয়েকজন? তাদের তো একটা ব্যবস্থা চাই? তা ছাড়া অতগুলো যে-জিনিসপত্র এলো সেগুলোও তো আর ফেলে দেওয়া যায় না? যথাযোগ্য বাসন-কোশন কিছু-কিছু ভাড়া করতে হয়েছে সে-জন্যে। অনসূয়ার দুঃখিনী মা, ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে উঠছে তাঁর বুক, বারে-বারে চোখ মুছছেন তিনি। রান্নাঘরের দাওয়ায় ব'সে তরকারি কুটতে-কুটতে কত কথা মনে হচ্ছে তাঁর। মা হ'য়ে তিনিই কি কম কষ্ট দিয়েছেন এই মেয়েকে? দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন, একটা কথা বলেননি, বলতে প্রবৃত্তি হয়নি। কিন্তু আজ? আজ বিদায়ের দিনে বুক ভেঙে যাচ্ছে না সে সব ভেবে? কে জানে কেমন বিদায়। কে জানে ওর অদৃষ্ট ওকে আবার কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অদৃষ্ট। অদৃষ্টের নামে দোষ দিয়েই কি সব সারতে পারবেন আজ? সেই অদৃষ্টের রচয়িতা কারা তা কি তিনি জানেন না? কাদের জন্য আজ ওর এই দুর্গতি? একটা পরবুদ্ধি, দুর্বলচরিত্র বাপ, আর একটা অসহায়, ভীরু, কুসংস্কারের ঢিপি মা। কী চেয়েছিলো অনসূয়া? কতটুকু তার দাবি ছিলো? 'শুধু বিয়েটা বন্ধ করো।' পায়ের উপর মুখ ঘ'ষে কেঁদে-কেঁদে এই তো একমাত্র মিনতি। আশ্চর্য! ঐটুকু হৃদয়বৃত্তিও কি তখন ছিলো না তাঁদের। কেন ছিলো না? ভাবতে গেলে, ওর অপরাধ ছিলো কী? নিজেদের বুদ্ধির দোষেই তো এমন হ'লো। বাপ

না-হয় অন্যমনস্ক সাংসারিক বুদ্ধিহীন মানুষ, কিন্তু তিনি? মা হ'য়ে তিনি কেন আগে থেকেই শাসন করেননি, সংযত করেননি? কেন অমন অবাধে মেলামেশায় প্রশ্রয় দিয়েছেন? ভালোবাসা কি অন্যায়? ভালোবাসা কি পাপ? হৃদয় কি জাতের দোহাই মানে? জাত কি লেখা থাকে মানুষের আকৃতিতে। জাতের বিভিন্নতাই কি স্নেহপ্রেমের বিভিন্নতা আনতে পারে? তবে?

বিনয় যেদিন বলেছিলো সেই কথা, অনসূয়ার বাবা যতই চমকে উঠুন না কেন, তিনি নিজে এতটুকুও অবাক হননি। আগুন কি চাপা থাকে? অনসূয়ার পরীক্ষার সময় বিনয়ের ব্যাকুলতা কি অনেক কথাই ব'লে দেয়নি তাঁদের? বিনয়ের দিদি বলেছিলেন, নিজের পরীক্ষাতে তো এত অস্থির হ'তে দেখিনি, এ যে নাওয়া-খাওয়াও চুকে গেছে। হেসেছিলেন। সে-হাসি ছিলো শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। তিনি, অনসূয়ার মা, বুঝেছিলেন যে বিপদ আসছে। কতদিন রাতের পর রাত মেয়েকে চুপচাপ জানলায় ব'সে কাটাতে দেখেছেন, দুই চোখে ধারা ব'য়ে গেছে, আয়নায় দেখেছেন তার প্রতিবিম্ব। বিনয়ের বিলেত যাবার তারিখ ঠিক হ'য়ে যাবার পরে অনসূয়া ভালো ক'রে ভাত খায়নি কোনোদিন। তবুও যদি সেই প্রস্তাব শুনে তিনি গালে হাত দেন তাকে আর ন্যাকামি ছাড়া কী বলে? অবিশ্যি অনসূয়ার কান্না দেখে এমন কথাও একদিন নিভৃতে বলেছিলেন অবিনাশবাবু—থাক গে সমাজ, কী হবে আমার সমাজ দিয়ে? মেয়ে যাতে সুখী হবে তাই আমার সুখ। না-হয় বিয়ে দিয়ে আবার বিদেশে কোনো চাকরি-বাকরি নিয়ে চ'লে যাবো।

তারপর সেই মানুষই একদিন কত বড়ো শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালো। কী

করলো বিকাশ? কী মন্ত্র দিলো? কী পরামর্শ দিয়ে অমন ভালো মানুষটাকে একেবারে পিশাচেরও অধম ক'রে ফেললো চক্ষের পলকে। বাপ হ'য়ে সন্তানের প্রতি এমন অপরিসীম বিতৃষ্ণা কেমন ক'রে তিনি বহন করলেন হৃদয়ে?

এমনি চৈত্রমাস ছিলো তখন। এমনি নিবিড় হাওয়া, ঝরা পাতার রাশি বাগানে, আমের মুকুলে ভ'রে গেছে গাছের ডাল, কচি-কচি পাতা উঠেছে কোনো-কোনো গাছে— বাতাবি ফুলের গন্ধে বাড়ি আকুল। ঘুরে-ঘুরে বাগান দেখছিলেন তিনি। অবিনাশবাবু নদীর ধারে গেছেন জুতো কিনতে, অনসূয়া মন-খারাপ ক'রে ঘরের ভিতরে কী করছে কে জানে। বাচ্চারা এখানে-সেখানে খেলছে। হন্তদন্ত হ'য়ে একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে বিকাশ ঢুকলো ফটক খুলে। কলকাতা থেকে এসেছে সে টেলিগ্রাম পেয়ে। চোখোচোখি হ'তেই বোমা ফাটলো— 'কী! ব্যাপার কী আপনাদের? একটা মেয়ের জন্য কি শেষে বংশের নাম ডোবাবেন?' হকচকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ মাথা নিচু ক'রে অপরাধীর মতো। 'কাকা, কাকা,' ব'লে ছুটে এলো বুলু আর মণ্টু। তাদের ঠেলে দিলো সে— 'কোথায়? কোথায় আপনাদের সেই আদরিণী বিদুষী কন্যা? বাদামতলি ইস্টিশন থেকে এটুকু রাস্তা আসতে-আসতে কত খ্যাতি শুনলাম তার, একবার দেখি তাকে।'

কী বিশ্রীই কেটেছিলো সেদিনের সেই হাওয়া-ভরা চৈত্রের সুন্দর সন্ধ্যা। সেদিন সারারাত জেগে-জেগে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললেন অবিনাশবাবু। রাত ভোর হ'লে সারাদিন পরামর্শ করলেন। তারপর

কত সারাদিন আর কত সারারাত যে মন্ত্রণা ক'রেই কাটলো দুই ভাইয়ে তার আর সংখ্যা নেই। তিনি তো তখন তৃতীয় ব্যক্তি।

অবশেষে বিনয়কে ডেকে এনে একদিন অপমান করলো বিকাশ, চাকর-বাকরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্রি গালাগাল দিলো। ছুটে এসেছিলো অনসূয়া, টুকটুকে লাল মুখ, বড়ো-বড়ো চোখ, বুকটা এতখানি উঠছে পড়ছে নিশ্বাসের ঢেউয়ে, দাঁড়ালো এসে মাঝখানে— 'না! না! না! এ আমি হ'তে দেবো না। দেবো না! কেন? কিসের অধিকারে আপনি ভদ্রলোককে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে এনে অসম্মান করবেন?' যেন থিয়েটারের একটা দৃশ্য।

মেয়েকে সেদিন আস্ত রাখেননি তিনি। চুলের মুঠি ধ'রে দেয়ালে ঠুকতে-ঠুকতে বলেছিলেন, 'তুই মর, তুই মর, তুই ম'রে যা। না-হয় যার জন্য তোর এত দরদ বেরিয়ে যা তার সঙ্গে।' কেন বলেছিলেন, কী এমন দুরন্ত অন্যায় সেদিন সে করেছিলো ও-কথা ব'লে? আজকে আর ভেবে উঠতে পারলেন না সে-সব।

আর বিনয়ের দিদি। ফর্শা ফুটফুটে ছোটোখাটো দুঃখী মানুষটি। তাঁর কথাও আজ মনে পড়লো তাঁর। কত কষ্টই পেলেন ভদ্রমহিলা। অথচ তাঁর কী দোষ ছিলো। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাঁকেও কত নাকাল করলো বিকাশ। অত বড়ো ঘরের বৌকে পথে বার করলো তবে ছাড়লো।

আর আমরা! আমাদের কী হ'লো। যার পায়ে পা মিলিয়ে এতটা হাঁটলাম, গলায় গলা মিলিয়ে শেয়ালের ডাক ডাকলাম, অঙ্গুলিহেলনে উঠলাম আর বসলাম, আমাদের কী করলো সে? বাড়ি থেকে ঘর থেকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ ক'রে এনে এই বস্তিতে বসালো— এই তো?

T

এদিকে নিজের দোতলা বাড়িতে ঘর বাড়াচ্ছে সে। দেশের জমিজমা সব চেটেপুটে খেয়ে সে বড়োলোক হচ্ছে। শুনলে অবিনাশবাবু যতই খিঁচিয়ে উঠুন, অনসূয়ার মা এ-কথা ঠিকই জানেন তাঁদের অত সাধের বাড়িটির আর অস্তিত্ব রাখেনি বিকাশ। সে যে প্রত্যেক বছরই যায় সে-খবর কি রাখেন না তিনি? সেবার কালিঘাটে তিনুর মা কি বলেননি সে-কথা? পাষণ্ড কোথাকার! বিশ্বাসঘাতক! ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে মনে-মনে ব্যাকুল কান্নায় তিনি উছলে উঠলেন— বোকা ভালোমানুষ ভাই পেয়ে যত তুই ঠকালি, দুর্বল স্নেহের সুযোগে যত দুঃখ দিলি, সব দুঃখ একদিন তোর বুকে জ্ব'লে উঠবে দ্বিগুণ হ'য়ে। একদিন তুই জানবি দুঃখ কী! দুঃখ কাকে বলে।

দুটো ছেলের একটা ছেলে এই বয়সেই কারখানায় ঢুকেছে মিস্ত্রিগিরি করতে, আরেকটি লেখাপড়ায় নেহাৎই ভালো ব'লে পড়া ছাড়তে দেয়নি অনসূয়া। অবিনাশবাবু চটেছিলেন— 'ন্যাকামো! লেখাপড়া শিখে তো সব লাট-বেলাট হবেন। সবাই সব হলেন, আর এখন—' কী মানুষ কী হ'য়ে গেছেন। অভাবের তাড়নায়, দুঃখের তাড়নায় আর আছে নাকি কিছু মনের মধ্যে, মাথার মধ্যে! তা নইলে আজ এমন ক'রে বলি দিতে পারতেন মেয়েটাকে? কেউ দেয়? কোনো বাপ কি পারে? বিষণ্ণ ব্যথিত ভাই দুটি দিদির আসন্ন বিচ্ছেদব্যথায় কাতর হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। দিদিই তাদের সব। সেই দিদিকে আজ ছাড়তে হবে তাদের। দুই ভাই-ই লজ্জা ভেঙে সকাল থেকে চোখ মুচছে কেবল। তারা কি বোঝেনি, তারা কি জানেনি তাদের দিদিকে আমরা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছি হাত-পা বেঁধে। বড়ো হ'য়ে তারা বলবে কী?

ভাববে কী? মা হ'য়ে বাপ হ'য়ে সন্তানের এতো বড়ো সর্বনাশ করবার কী কৈফিয়ৎ দেবেন তখন? বুলু এলো না! আসতে দিলো না তার শাশুড়ি। অনসূয়া যে তার বৌ-এর বোন এই লজ্জাই তিনি ঢাকতে পারেন না, আবার সমারোহ ক'রে বিয়েতে পাঠাবেন! ছিঃ। তা তো ঠিকই। অনসূয়া কি সম্পর্কের যোগ্য? আর তা ছাড়া আসবেই বা কেন? কে গিয়ে তাকে নিয়ে আসছে সমাদর ক'রে? এলেই তো খরচ। যে-কটি মুখ আছে তাই ভরানো দায়, আবার বোঝার উপর শাকের আঁটি। অনসূয়া চ'লে গেলে কী ক'রে দিন চলবে সেটাই তো এখন মস্ত ভাবনা। অবিনাশবাবু উদয়াস্ত খেটে অস্থিচর্মসার হ'য়ে মাত্র আটান্ন টাকা পান, আর বড়ো ছেলে ছত্রিশ। আর অনসূয়ার একারই তো উপার্জন উননব্বুই টাকা।

হায় রে! কত সাধের অনসূয়া তাঁর, কত আকাঙ্ক্ষার ধন। আজ তাঁর সেই মেয়ের বিয়ে। সেই অনাই সোনার। ফটকের দু'দিকে লাল শালুমোড়া উঁচু ঘরে নহবৎ বসবে সাতদিন আগে থেকে, আত্মীয়-কুটুম্বে থৈ-থৈ করবে বাড়ি। পুকুরের এতদিনের যত্নে লালিত বড়ো-বড়ো রুই-কাৎলা ধড়াস-ধড়াস আছড়ে এনে ফেলবে উঠোনে, পান-খাওয়া লাল দাঁত বার ক'রে বকশিষ চাইবে নবীন জেলের নাতি পরান কৈবর্ত। হৈ-হল্লা, গান-গল্প, আনন্দের স্রোত ব'য়ে যাবে কুসুমপুরের চৌধুরী-বাড়িতে। অবিনাশবাবু ছুটে আসবেন ব্যস্ত হ'য়ে, 'কই, তুমি কোথায়? ঢাকা থেকে অমৃতি এসেছে যে, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, মানিকগঞ্জের চন্দনচূড় দই—' লাল-পাড় শাড়ির হলুদমাখা আঁচলে ঘাম মুছতে-মুছতে ছুটে আসবেন তিনি, 'ও মা, ভীমনাগের সন্দেশ আসেনি এখনো, আর আসবে কবে?'

সন্ধেবেলা ঝমঝমে বিলিতি বাদ্যে ভ'রে যাবে বাড়ি। তারা এসেছে ঢাকা থেকে পানশি নৌকোয় চ'ড়ে। দশ দিন বাজিয়ে মোটা টাকা নিয়ে ফিরে যাবে। শাদা-শাদা এপ্রনের উপর লালপটি-বাঁধা কোমর, পেতলের তকমা আঁটা। চলন হবে এক মাইল জুড়ে, নদীর ঘাট থেকে জামাইকে তিনশো ঝাড়ের আলোয় বাজনাবাদ্যি আসাসোঁটা দিয়ে প্রোসেশন ক'রে আনবেন তাঁরা। চব্বিশ বছরের বলিষ্ঠ সুন্দর সুকুমার ছেলে।

আশ্চর্য! অবাক হ'য়ে ভাবলেন অনসূয়ার মা, আজকে, আজকের দিনেও এমন ক'রে সেই মানুষটিকেই মনে প'ড়ে গেল তাঁর? তখনো, যখনি তিনি অনসূয়ার বিয়ের কথা ভেবেছেন, এই বিনয়কেই মনে-মনে দেখতে পেয়েছেন তিনি। তাই ব'লে আজ? আজও সেই ছেলেই তাঁর চোখের তলায় এসে দাঁড়ালো? তরকারির জল-ভরা গামলায় টপটপ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়লো তাঁর চোখ থেকে। বেলার দিকে তাকিয়ে, নিশ্বাস ফেলে সাতান্ন বছরের শির-ওঠা দুর্বল হাতে তাড়াতাড়ি আলুর খোসা ছাড়ানোতে মন দিলেন।

উপসংহার

এক

বেলা গেল। গ'লে গেল সূর্যাস্তের সোনা। চব্বিশ ঘণ্টার বিরহের পর মুহূর্তকালের জন্য মিলিত হ'লো— দিন আর রাত্রি। রান্নাঘরের কোণে ছাইয়ের গাদায় সরু-সরু হলদে নিমপাতা ঝুরঝুর ক'রে ঝ'রে পড়লো দমকা হাওয়ায়। নোংরা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে চমকে তাকালো বেড়ালটা। ঝড় উঠলো। কালবৈশাখী। নারকেল গাছের মাথায়-মাথায় পরিদের নাচন লাগলো, মাটিতে শুকনো পাতার ঘূর্ণি। এ-বাড়ির জামা উড়িয়ে, সে-বাড়ির শাড়ি ছিঁড়ে, জানলা-দরজার ঢাক বাজিয়ে আবার তিন মিনিটে শান্ত হ'লো দুরন্ত কৌতুক। কাকগুলো কা কা ক'রে কোথায় উড়ে গিয়েছিলো— আবার বসলো এসে চুপচাপ গাছের মাথায়। পাতার ঝোপে-ঝোপে শালিখের ধানরং ঠোঁট চোখ চিকচিকালো। ঘরে-ঘরে পনেরো পাওয়ারের বদলে পঁচিশ পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠলো উৎসব-বাড়িতে।

উঠোনে পয়েণ্ট নেই, কোথা থেকে মণ্টু একটা গ্যাস নিয়ে এসেছে জোগাড় ক'রে। পাশের ঘর থেকে হিরণ-মাসিমা এলেন। সারাদিনে আরো অনেকবারই এসেছেন, দেখেছেন, শুনেছেন, আদেশ দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন, হাঁকে-ডাকে সরগরম করেছেন বাড়ি। কাজের মানুষ, ঠাকুর তো এসেছে কত বেলায়, সকাল বেলাকার সমস্ত রান্না-বান্না ভাগ-বাঁটোয়ারা, অধিবাসের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা সব ঝক্কিই ছিলো

তাঁর হেফাজতে। অনসূয়ার মা-র কতটুকু শক্তি। বেচারা। ভুগে-ভুগে এখান থেকে এইটুকু যেতেই তো হাঁপান। এবার তিনি এলেন মেয়ে স্নান করাতে। ধ'রে-ধ'রে অনসূয়াকে নিয়ে এলেন উঠোনে, দু'পাশে কলাগাছ পোঁতা, মাঝখানকার পিঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে কাঁচা হলুদ মাখিয়ে দিলেন গায়ে। আরো দু'জন এয়ো এলো সাত পাক সুতো ধ'রে আম্রপল্লব-ছোঁয়া ঘড়ার জল মাথায় ঢালতে। কলকল ক'রে সাত ঝাঁক উলু দিলো তারা। জলভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন মা।

অবিনাশবাবু চটির শব্দ করতে-করতে পাশ কাটিয়ে একবার ঢুকলেন গিয়ে নিজের ঘরে, কী করলেন না-করলেন, আবার বেরিয়ে গেলেন উঠোন পার হ'য়ে। হাতা-খুন্তির শব্দে, মাছ-মাংসের গন্ধে, একই চালের তলায় দশ ঘর ভাড়াটের অগুনতি অসংযত বাচ্চাকাচ্চার ভিড়ে, স্বতঃপ্রবৃত্ত পড়শি মহিলাদের সহৃদয়তায় হঠাৎ যেন বাড়িটা গমগমে হ'য়ে উঠলো। স্নান ক'রে চুল মেলে দিয়ে হাতির দাঁতের মতো রঙের নতুন চিকন পাটিতে এসে বসলো অনসূয়া। হিরণ-মাসিমা চিরুনি দিয়ে জট ছাড়াতে বসলেন। ঘনকালো মেঘ না-হ'লেও এখনো চুল আছে। না-বেঁধে, না-আঁচড়িয়ে কেমন পাকিয়ে-পাকিয়ে গেছে। রঙের ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু ফ্যাকাশে হ'য়ে আরো ফর্শা দেখায়। রোগা হ'য়ে গিয়েও হাতের গড়ন ভাঙেনি, মোমের মতো গোল, মোমের মতোই রক্তহীন, মসৃণ। প্রসাধনের অভাব কী? অধিবাসের ট্রে থেকে একে-একে সব তিনি টেনে নিলেন। সাজাতে-সাজাতে হাসিমুখে বললেন, 'কপাল করেছিলি বটে, টাকা না, কড়ি না, দেখলো আর রাজার মতো মানুষটা যেন

উড়াল দিয়ে নিতে এলো। ঈশ! কী দেওয়াটাই দিয়েছে!' কথার শেষে দীর্ঘশ্বাসও পড়লো একটি। একদিন না, দু'দিন না, পাশাপাশি ঘরের ভাড়াটে হ'য়ে সুখে-দুঃখে কত বছর একসঙ্গে তো কাটলো। বিদায়ের দিনে মন-কেমন করে বৈকি। নিজের মেয়েটা ভুগে-ভুগে এই তো বছর দুই আগে চারটে বাচ্চা রেখে মারা গেল। বড়ো ছেলেটা বিয়ে ক'রে শ্বশুরবাড়িতেই ঘর নিয়েছে, ছোটোটা তবু পদে আছে, তা ক'দিন কে জানে। অভাবে কি আর মানুষকে মানুষ থাকতে দেয়। অনসূয়া তাঁর সর্বাণীর বয়সী না হ'লেও তিনি তাকে ভালোবাসেন। সর্বাণীকে যেমন বাসতেন তেমনিই বোধ হয়।

চাটালো বেণীতে জরি জড়িয়ে রুপোর কাঁটা দিয়ে প্রকাণ্ড মাথাজোড়া চালিখোঁপা বাঁধলেন, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দামি স্নো লাগালেন গালে, ঘন ক'রে পাউডার বুলোলেন মুখে বুকে গলায় হাতে। লবঙ্গ দিয়ে ছোটো-ছোটো ফুল এঁকে দিলেন তেত্রিশ বছরের লাঞ্ছিত বঞ্চিত কপালে। যাই-যাই ক'রেও যে-লাবণ্য এতদিন আত্মগোপন ক'রে ছিলো ভাঙা গালের খাঁজে-খাঁজে, ডোবানো চোখের তারায়, সব উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো একটুখানি যত্নে। কম্পোজিটারবাবুর মেজো মেয়ে ছুটকি পাৎলা পায়ে আলতা পরিয়ে দিলো। ছোপ-ছোপ লাগলো পাটিতে, বুড়ো নখের মতো ছোট্ট নীল শিশির পাগল-করা গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের আনাচে-কানাচে। চুলের কাঁটায়, ফিতের লালে, ছড়ানো-ছিটোনো ব্লাউজে শাড়িতে, নতুন বিছানার কোরা গন্ধে, রঙিন কুলোর সরা-ঢাকা প্রদীপে, সব মিলিয়ে তারও বাইশ বছরের অবিবাহিত মন কেমন

আকুল হ'য়ে উঠলো। হেলানো আয়নায় চুপে-চুপে মুখ দেখলো বার-বার।

এতক্ষণে মা এলেন অবসর হ'য়ে, হাতে এক গ্লাশ শরবৎ নিয়ে এলেন মেয়ের জন্য। আহা! সারাটা দিন গেছে এক ফোঁটা জল মুখে দিলো না? 'একটু খা।' মুখের কাছে ধরলেন গ্লাশটা। অনসূয়ার বুক ঠেলে বমি এলো। তিনি নিজেই কি সারাদিন মুখে দিতে পেরেছেন কিছু? বমি-বমি তো তাঁরও করেছে।

বাবলু প্রস্তুত হ'তে এলো জামাই আনতে যাবার জন্য। ঘরের কোণে আলনা থেকে কাচা কাপড় আর ডুরে-কাটা ইস্তিরি-করা শার্ট গায়ে দিলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। অনসূয়াই কেচে দিয়েছে কাল। বিয়ে-বাড়িতে কি ওরা ময়লা ছেঁড়া প'রে বেড়াবে? আড়চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে চোখে জল এলো বাবলুর। আজ দিদি এখানে— কাল? কাল এমন সময় দিদি কোথায়? ভাবতেই নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে এলো।

সোনাদানা কী-ই বা আছে আর? তবু যা অবশিষ্ট ছিলো নিজের গায়ে, কাঁপা-কাঁপা হাতে সেই সব খুলে একে-একে পরিয়ে দিলেন মা। তারপর কন্যার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন হু-হু ক'রে। অবিনাশবাবু কী বলতে দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। হিরণ-মাসিমা লাল-পাড় শাড়ি ছাড়িয়ে ক্রেপের লাল বেনারসি পরিয়ে দিলেন। লগ্ন তো প্রথম রাত্তিরেই। এখান থেকে এখানে, জামাই তো এলো ব'লে।

অনসূয়া ব'সে রইলো নিথর, নিস্পন্দ। যেন পাথর হ'য়ে গেছে। কিছুই ভাবছে না সে, কিছুই দেখছে না। কিছুতেই যেন আর কিছু

এসে যায় না তার। তার বিকার নেই, দুঃখ নেই, আসক্তিও নেই। যা হবার হোক, যা-হয় হোক।

*　　　*　　　*

হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে বাড়ি। চমৎকার। চমৎকার ফ্ল্যাট। কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিলেন মিস্টার রায়। পশ্চিমে গড়ের মাঠ, শোবার ঘরের শিক ছাড়া মস্ত জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। ভাড়া বড্ড বেশি? তা হোক। এত তাড়াতাড়ি, এত ভালো জায়গায় এমন সুন্দর একটি সাজানো-গোছানো বাড়ি যে তাঁরা বার করতে পেরেছেন খুঁজে তাই তো যথেষ্ট। বয় বেয়ারা কল জল সব ঠিক। একদিন কেন, একবেলার জন্ত উঠলেও অসুবিধে ক'রে থাকা যায় না। তারপর আত্মীয়-পরিজন না থাকুক (অবিশ্যি আজকের দিনে বহু আত্মীয়কে পলকপাতে নিয়ে আসতে পারেন এখানে, কিন্তু আত্মীয়তার মোহ আর তাঁর নেই জীবনে) আপিশের কিছু পদস্থ কর্মচারী এবং জনকয়েক বন্ধু তো আছেন সঙ্গে?

সন্ধের একটু আগে খানিকক্ষণ ঘুরে নিলেন শহরটা। সেই কলকাতা। কত কাল, কত কাল পরে আবার কলকাতা। কত প্রিয় কলকাতা। আবার তিনি কলকাতায় এসেছেন। উটরাম ঘাটে এসে চা খেলেন বন্ধুদের নিয়ে, জলের গন্ধে মন-কেমন করলো। এই গঙ্গার বুক বেয়েই তো একদিন ছেড়ে গিয়েছিলেন এই মাটি, এই শহর। তখন কি ভেবেছিলেন আবার এসে পা রাখবেন এই বন্দরে? এলোমেলো গেলেন মার্কেটে, দু'চোখে যা দেখলেন কিনলেন পাগলের মতো, এলেন সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রেলের কাছে, কার্জন পার্কে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসলেন ঘাসের মখমলে, রেড রোড দিয়ে হু-হু ট্যাক্সি চললো খানিকক্ষণ, তারপর

আবার ফিরে এলেন ঘরে। ততক্ষণে আলো জ্বলেছে, ঝলমলে চৌরঙ্গি। একজন বৃদ্ধ কর্মচারী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন গিয়ে। মেয়ে না-হ'লে কী চলে? মেয়ে ছাড়া কী শুভকর্ম হয়? নিয়মকানুন আছে না? কে ব'লে দেবে সব? মিস্টার রায় হাসলেন। নিয়ম। তা-ই তো বটে। দিদির বয়সী ভদ্রমহিলা, তেমনিই ছোটোখাটো কিন্তু শ্যামাঙ্গী। ভালো লাগলো হঠাৎ। সত্যিই তো। মেয়ে না-হ'লে চলে? মিস্টার রায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি জিব কাটলেন, শান্তিপুরি শাড়ির চওড়া লাল লতাপাড় আরো একটু কপালের দিকে টেনে বললেন, 'না বাবা, আজকের দিনে ঐ বিজাতীয় পোশাক আপনি পরতে পারবেন না। যাবার সময় কপালে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করবো, সেই কুলো কই? কুটুম্বরা নিতে আসবে, দই মিষ্টি কই তাদের জন্য? পান তামাক কই?'

আছে, আছে, সব আছে। টাকা থাকলে কী না আছে কলকাতা শহরে? টানা-টানা হাতের লেখায় তৈরি হ'লো অণুকোটি চৌষট্টি ফর্দ, তিন গাড়ি তিন দিকে ছুটলো। বৌ-পরিচয়ের হীরের বালা, আর বৌভাতের বেনারসি শাড়িও বাদ পড়লো না সেই ফর্দ থেকে। কে বৌ-পরিচয় করবে? কেন, আমি। বৌভাত আর হবে কখন? কাল দুপুরে। হাসিখুশিতে উপচে-পড়া শাঁখায় সিঁদুরে টুকটুকে সরল মুখে নিশ্চিন্ত জবাব। না-ই বা হ'লো আত্মীয়, তবু তো মানুষটি তাঁর ছেলের মতোই? বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, ছেলে হয়েছিলো চোদ্দতে। বেঁচে থাকলে তো এঁরই মতো হ'তো সে। মিস্টার রায় যে কাল সকালেই আবার উড়ে ফিরে যাবেন সে-কথা তিনি আমলেই আনলেন না। কাজ? থাক কাজ। কাজ আছে ব'লে তো আর

নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে পারে না! এই হ'লো গিয়ে বিয়ে। বিয়ে আগে না কাজ আগে? ঠিক। মিস্টার রায় আবার হাসলেন।

সরানো হ'লো মাঝখানকার সোফা সেটি কৌচ কার্পেট। আলো চাল আর ভিজবে কখন, ময়দা গুলেই ঘরের লাল মেঝেতে শাদা পদ্ম আঁকলেন তিনি, নিদ্রাকলস এঁকে দিলেন চার পাশে। মঙ্গল-চিহ্ন। যাবার আগে এইখানে দাঁড়িয়ে কপালে কুলো ছুঁইয়ে ধান-দুর্বো মাথায় নিয়ে তবে তো যাবেন বিয়ে করতে? সহাস্যে সব দেখলেন মিস্টার রায়, সব শুনলেন, মনে-মনে এও চিন্তা করলেন কালকের যাওয়াটা একটু পিছিয়ে দেওয়া কোনোরকমেও সম্ভব কিনা। তারপর কাঁধে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে একঘণ্টা ধরে স্নান করলেন ঝরনার তলায় দাঁড়িয়ে।

বেরিয়ে এসে বাহান্ন ইঞ্চি বহরের কুঁচোনো শান্তিপুরি ধুতি প্রস্তুত পেলেন হাতের কাছে, পাট-করা গরদের পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর। একটু সময় লাগলো পরিপাটি ক'রে ধুতিটা পরতে। একেবারে ফিটফাট জামাইবাবু। এই, এই তো কী সুন্দর দেখাচ্ছে। এ না-হ'লে বিয়ে? ভারি খুশি। না না, কপালে একটু চন্দন দিতে হবে বৈকি। তা কি হয়? নিয়ম আছে না শুভ কাজে? অনুষ্ঠান আছে না? অনুষ্ঠানই তো মঙ্গল। কতকাল পরে কোমরে ধুতি জড়ালেন? আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে মিস্টার রায় নিজেকে যেন চিনতে পারলেন না। বিছানার উপর টোপর আর ফুলের মালার দিকে তাকিয়ে কৌতুক বোধ করলেন।

* * *

না, বিকাশ এলো শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে নিয়ে, ছেলেমেয়েদের অবিশ্যি না। ঐ সব বিশ্রী, কুশ্রী ব্যাপারে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আনাটা

কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। মক্কেলদের সেদিনের মতো বিদায় দিয়ে এসে ভুরু কুঁচকে স্ত্রীকে বললো, 'যাওয়াই স্থির করলাম, বুঝলে ?'

স্ত্রী বললো, 'হুঁ।'

'তারা যেমনই হোক, আমার তো একটা কর্তব্য আছে।'

'তাই তো।'

স্ত্রীর মুখের কাছে এসে ঠোঁট বেঁকিয়ে এবার সে হাসলো। 'তখন না আমাকে বড়ো অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া হ'লো ? আর এখন ? এখন কী শুনি ?'

'কী এখন ?'

'কী এখন!' হাতের ভঙ্গি ক'রে স্ত্রীকে ভ্যাংচালো বিকাশ— 'বললাম না সকালবেলা এসে ? আসলে মৎলবখানা তো এই ছিলো আগাগোড়া, অর্থাৎ একলা খাবে, ভাগ দিতে কি পরানে সয় ?'

ভালোমানুষ স্ত্রী ব্যথিত হলেন স্বামীর কথায়— 'মতলব পুষবার মতো মাথা তো নয় ভাসুরঠাকুরের আর দিদিও—'

'নাও, নাও, চুপ করো! চিনতে আর আমার বাকি নেই কাউকে। আচ্ছা চলো না, দেখবেই তো সব। হাতে-হাতেই প্রমাণ পাবে। চাক্ষুষ প্রমাণ না-হ'লে তো গরিবের কথায় আর বিশ্বাস হবে না তোমার ? স্বামীর চাইতে তো তোমার ভাসুর জা-ই অনেক বেশি কিনা!' স্ত্রী চুপ ক'রে রইলো। গজগজ ক'রে চললো বিকাশ, 'ঈশ্। কত তেজ দেখানো হ'লো তখন। মেয়ে বিক্রি! মেয়ে বিক্রি করবো না। আর এখন ? এখন কী করলে ? বিয়ে। আবার নাম দেওয়া হয়েছে বিয়ে। ষোড়শোপচার সাজিয়ে ডামাডোল বাজিয়ে রাজপুত্র আসছেন কিনা

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হ'য়ে ঐ বুড়ো মেয়েকে রাজরানী সাজাতে! নাম নেই, ধাম নেই, জাত-গোত্র কিছুরই সঙ্গে দেখা নেই, মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন। কী? না, মস্ত ধনী, মস্ত ব্যবসায়ী, বোম্বেতে সবাই চেনে— তা আর চিনবে না? আহা রে, কী সুন্দর পরিচয়! ঈশ্বর তো আছেন? সেই প্রতিশোধই হবে আজ বিয়ের আসরে।' প্রতিশোধ! রোগা হাতের মোটা শির ফুলিয়ে স্ত্রীর মুখের কাছেই মুঠি শক্ত করলো। চশমাটা ঝুলে পড়লো নাকের ডগায়।

লগ্ন হ'য়ে এলো, বরের দেখা নেই। বাড়িশুদ্ধু লোক উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো, অবিনাশবাবু ঘর-বার করতে লাগলেন, এগিয়ে গিয়ে বটতলার মাথা ঘুরে এলেন। যান-বাহনের স্রোত ব'য়ে চলেছে বড়ো রাস্তা দিয়ে, কেবল প্রত্যাশিত গাড়িটিরই দেখা নেই। বাবলুই বা করছে কী? বোকা ছেলে! এত বড়ো হ'লো তবু যদি বুদ্ধি হ'লো কিছু। দেরি হচ্ছে তো তুই ছুটে আয়, একটা খবর দে এসে। না-হয় একটা ট্যাক্সি ক'রেই আয়, লাগুক টাকা বেশি। ঠিকানা মিলিয়ে যেতে পারলো তো? না কি ভুল ঠিকানা দিয়ে গেছে? না, না, তা দেবে কেন? তাতে আর ওদের কী স্বার্থ? বরং ক্ষতি। তবে? তবে কী? ঘরে ঢুকে ঘড়ি দেখলেন, বুকের মধ্যে যেন কেমন করতে লাগলো। হে ঈশ্বর! আর কত? আর কত?

মা-ও ছটফট করলেন বৈকি। জানলায় দাঁড়িয়ে রইলেন গালে হাত দিয়ে, এলেন উঠোন পেরিয়ে টিনের দরজায়, একটু থামলেন, গলি

দিয়ে দু'পা হাঁটলেন, আবার ফিরে এলেন ঘরে। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা আরামও বোধ করলেন মনে-মনে। না-ই যদি আসে, তা হ'লে না-ই বা এলো। এতগুলো বছরই যদি এমনি কেটে যেতে পারলো, তা হ'লে কাটুক না বাকি জীবন! কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে এমন তো কত অবিবাহিত মেয়ে চিরকাল বাপের ঘরে থেকে বুড়ি হ'য়ে যায়। কত মেয়ে তো বিধবা হ'য়ে জীবন কাটায়। তবে অনসূয়ার বিয়ের জন্যই বা কেন তাঁরা অমন ব্যাকুল হ'য়ে গিয়েছিলেন? কী সংগত কারণ ছিলো তার? অনসূয়া এ-সংসারের হাল ধ'রে আছে, অনসূয়ার শরীরের সমস্ত নির্যাস টেনে-টেনে বেঁচে আছে এই সংসার। তাকে বিদায় দিয়ে কী এমন সুখ বাড়বে? শান্তি বাড়বে? সে চ'লে গেলেই তো বরং সব অন্ধকার। শুধু কি ভাতের খিদেতেই টান পড়বে? সব, সব খিদেই মিলিয়ে যাবে জীবন থেকে। মানুষের খিদে তো এক রকমের নয়, খিদের অন্ত নেই। এইটুকু বাড়িকে যে সে পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখে, আর তার তিলতম ত্রুটি ঘটলেই যে তোলপাড় করেন অবিনাশবাবু, সেটাও কি এক রকমের খিদে নয়? ঝাড়ো, মোছো, ধোওয়াও; পালিশ দিয়ে ঝকঝকে ক'রে দাও ছেঁড়াজুতো, শেলাই করিয়ে দাও মুচি ডেকে, পুরোনো জিরজিরে ধুতি জামা ধবধবে ক'রে দাও সাবানে, নিখুঁত ক'রে রিপু করো; জানলার পর্দা, বালিশের ওয়াড়, রান্নাঘরের বাসন, চায়ের কাপ, ভাইদের বই— কোথায় হাত নেই অনসূয়ার? এটা চাই, ওটা চাই, সেটা কেন পাইনে, রান্না কেন ভালো হ'লো না, ডাল কেন কম, চাল কেন বাড়ন্ত, সব, সবটাতেই অনসূয়া। অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই এ-বাড়ির ঘড়ির কাঁটা চলছে, এ-বাড়ির অসংখ্য আবদার মিটছে। তবে সে-মানুষটাকে

বিদায় দিয়ে তাঁরা থাকবেন কেমন ক'রে? কী উপায় হবে? এক অন্ধকারে উঠে আরেক অন্ধকারে ঘুমিয়ে না-পড়া পর্যন্ত কলের মতো চলছে সেই মানুষটি। একটি শব্দ নেই মুখে, একটু বিরক্তির রেখা নেই কোথাও, রাগ নেই, দুঃখ নেই, হাসি নেই, মলিনতা নেই, কেমন ক'রে চালিয়ে গেল জীবনের এতগুলো বছর। নিজেকে পিষে ফেলে, মেরে ফেলে, এই সংসারের চাকায় ঘুরছে সে। একদিন বন্ধ করেনি সেই চাকা। আচ্ছা, একদিন কি অসুখও করেনি ওর? তা কি করেনি? কেউ জানেনি সে-কথা, কেউ জিগেস করেনি। নেহাৎ শুয়ে পড়লে ঘর জুড়ে আছে ব'লেই বরং রাগ হয়েছে। কিছুই ঠিকমতো হয়নি ব'লে একটা অশান্তির, অসন্তুষ্টির ঝড় ব'য়ে গেছে বাড়িতে। তৃপ্তি নেই কোনোরকমে। ও যে অনসূয়া। মা হ'য়ে তাঁরও কি খুঁতখুতানি কম ছিলো? অথচ এমন আশ্চর্য—

'দিদি, ঠাকুরমশাই বলছেন লগ্ন যে ব'য়ে যায়।'

অনসূয়ার মা অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকালেন ছোটো জায়ের মুখের দিকে। অনেক দিন পরে দেখলেন। দেখলেই ভালো লাগে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন— 'তাই তো।'

'আমি বলি কী, মণ্টু বরং একবার—'

'মণ্টু?'

'বর আনতে কি কেউ ও-রকম যায়? কত সব খাতির, যত্ন, আয়োজন তবে না! আমার মনে হয় ওরা রাগ ক'রেই আসছে না।'

'তা হ'লে?'

'বাবলু তো অনেকক্ষণ গেছে, আসা উচিত ছিলো না?'

হিরণ-মাসিমা ঢুকলেন ঘরে। বাড়ি থেকে ঘুরে এলেন একবার। চোখ কুঁচকে বললেন, 'বাবলু তো এসেছে।'

'এসেছে ?'

'দেখলাম তো বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর বাবার সঙ্গে কাকার সঙ্গে কী সব বলছে।'

'বর আসেনি ?' অনসূয়ার কাকিমার গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠলো।

'বর নাকি পরে আসছে।'

'পরে আসছে ? পরে আসছে মানে ? কী যে বোকা। আনতে গিয়ে কেউ সঙ্গে ক'রে না-নিয়ে আসে ?'

অনসূয়া সেই থেকে ব'সে আছে স্তব্ধ হ'য়ে, একবার চোখ তুলে নামিয়ে নিলো।

হন্তদন্ত হ'য়ে বিকাশ এসে ফেটে পড়লো— 'কী কাণ্ড বলো দেখি! কোথাকার কে সব!' কথা শেষ না-ক'রেই আবার বেগে চ'লে গেল বাইরে। এ-কথা কে না জানে যে লগ্নের জন্য তারা পরোয়া করে না। লগ্নের অর্থ কী তাদের কাছে ? দিয়েছে ফিরিয়ে, এখন ইচ্ছেমতো সুবিধে-মতো আসবে মস্ত গাড়ি নিয়ে, টাকাটি দিয়ে মেয়েটি নিয়ে চুপচাপ স'রে পড়বে অন্ধকারে। আবার পিটুলির লতা দিয়ে পাড়াপড়শি ডেকে পুরুৎ এনে ঘটা করা হচ্ছে— মেয়ের বিয়ে রটিয়ে। ভড়ংও জানে। এক্ষুনি তো সব ভড়ং মুছে যাবে, মিছিমিছি লোক ডেকে এই কেলেঙ্কারিটা কেন বাপু। ছেলেটাও তেমনি। মুখে আর আহ্লাদ ধরে না। খেতে দিয়েছে, আদর করেছে, ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ি চড়িয়ে, তবে আর কী ? মূর্খ! এত বড়ো ধেড়ে ছেলে হয়েছিস

আর এটুকু বুঝিস না এত তাদের কিসের গরজ? শুনলাম তো ঐ পাঁচশোটি টাকা ছাড়া আর একটি পয়সাও ছোঁওয়াবে না। যদি সত্যি হয় তা হ'লে তো চমৎকার! সমাদর করবে না? চকিতে ভাইঝির চন্দনচর্চিত মুখটা ভেসে উঠলো চোখে—মেয়েটা এখনো সুন্দর আছে কিন্তু। এত আছাড়েও—মচকেছে, কিন্তু ভাঙেনি। সাপের মতো চিকচিকিয়ে উঠলো বিকাশের চোখ। কত? কত মুনফা করবে? একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দুটো মোচড় দিলে কিছু কি আর বেরিয়ে না আসবে মোটা-মোটা পকেট থেকে?

ফুটপাতে, যেখানে বকুলগাছের গায়ে শিথিল শরীর এলিয়ে, জোরে-জোরে নিশ্বাস টেনে, গলির মুখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অবিনাশবাবু, সেইখানে এসে দাঁড়ালো বিকাশ। চোখ তীক্ষ্ণ ক'রে, কান খাড়া ক'রে। আসবে। তারা নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু কী ভাবে আসবে, কখন আসবে সেটাই সব চেয়ে বড়ো কথা, সেটাই দ্রষ্টব্য তার কাছে। সম্বর্ধনা তো করতে হবে? দাদা-বৌদির সঙ্গে একটি চোখোচোখির পালা তো আছে এতকাল পরে।

*　　　　*　　　　*

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো বিকাশের। তারা এলো, কিন্তু লগ্ন পেরিয়ে নয়, একটু আগে। সাত-আটখানা মোটর নিঃশব্দে এসে প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে থামলো তাদের দরজায়। গলিটা ভ'রে গেল। এসেছে, এসেছে, একটা গুঞ্জন উঠলো চারদিকে, বাচ্চারা ভিড় করলো এসে কাছে-কাছে, এত গাড়ি, এত বড়ো গাড়ি আর কবে তারা দেখেছে এই গলিতে? এই গলির কোন বাড়ির দরজায় কবে থেমেছে আর? বিয়ে কি আর-কারো

কারো হয়নি ? খেন্তিদির বিয়ে হ'লো না ? রাধারানীর বিয়ে হ'লো না ? সুমন্ত্রর বৌ এলো না ? সবাই হয় রিক্শা নয় ঘোড়ার গাড়ি চ'ড়ে এসেছে, মোটরে কেউ আসে নি। কেবল কয়েক বছর আগে জ্ঞানদা-ঠাকুমার নাতজামাই এসেছিলো ট্যাক্সি ক'রে। তার জাবর তো আজও কাটছে।

অবিনাশবাবু এগিয়ে এলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে। তবে এলো ? একে-একে নামলো সব সম্ভ্রান্ত চেহারার অতিথিরা— একটা শৌখিন গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। অবিনাশবাবু মুখ থেকে মুখে চোখ সরাতে লাগলেন। কে ? কে ? কোন জন ? বুকের মধ্যে তাঁর হাতুড়ি পিটতে লাগলো।

শান্তিপুরি ধুতির লম্বা কোঁচা সামলে সব শেষে নামলো বিনয়, অবিনাশবাবুকে দেখে হাত থেকে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে, নিচু হ'য়ে বিনীত হাস্যে প্রণাম ক'রে বললো, 'ভালো আছেন ?' চল্লিশ বছর বয়সেও তার চেহারার এমন-কিছু তফাৎ হয়নি যাতে তাকে চিনতে খুব দেরি হ'তে পারে কারো। একটু ভারি হয়েছে শরীর, আর ঘন চুল একটু পাৎলা। বহুদিন বিদেশ-যাপনের চিহ্নস্বরূপ রং সামান্য লালচে। বরং জানা না-থাকলে অবিনাশবাবুকেই চেনা দায় ছিলো বিনয়ের।

হাতের টোপর আর গায়ের চাদর দেখেই অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছিলেন কাছে, নিঃস্পৃহ, নিষ্প্রভ, বৃদ্ধ চোখে ভালো ক'রে তাকিয়েছিলেন ভাবী জামাইয়ের মুখের দিকে, এবার পিছিয়ে গেলেন দুই পা। প'ড়ে যেতে-যেতে টাল সামলালেন গাড়ির দরজায় হাত রেখে, নিশ্বাসের ঘনতায় পুরোনো ফতুয়ার উপর পাঁজরার ওঠা-নামা দেখা যেতে

লাগলো স্পষ্ট। বিনয় হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেললো। তারপরেই তাকালো সে বিকাশের দিকে। তার সাপের মতো ছুটি ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ, আক্রোশে স্থির, নিস্তব্ধ চোখের উপর চোখ মিলিয়ে রাখলো খানিকক্ষণ। গন্ধক জ্ব'লে উঠলো মনে, কষ্ট হ'লো নেবাতে, কিন্তু নেবালো। হেসে বললো, 'এই যে আপনি— আপনি কেমন আছেন?' বিকাশের দাঁতে দাঁত আটকে গেল, মাথার চুল যেন খাড়া হ'য়ে উঠলো। এ-ও হয়? এ-রকমও হয়? তবে কি দৈব ব'লে আছে কোনো-কিছুর অস্তিত্ব? এক মুহূর্ত, পরক্ষণেই সপ্রতিভ অভ্যর্থনায় অস্থির হ'য়ে হাঁকে-ডাকে সে সরগরম করলো বাড়ি। 'আরে, তোরা সব কোথায় গেলি? এই ভানু, শাঁখ বাজাতে বল না কাউকে। মণ্টু বাবলু কই? দাঁড়িয়ে আছিস কী হাঁ ক'রে? এঁদের ঘরে নিয়ে বসা না। আর কোথায়ই বা বসতে দেবো। গরিবের ঘর, এসো বাবা, এসো—' প্রায় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন বিনয়কে, আর বিনয় তার পায়ে-পায়ে যেতে-যেতে হাসবে কি রাগ করবে ভেবে পেলো না।

পাশের ঘরের ভাড়াটেরা একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলো বরযাত্রীদের জন্য। তাঁদের নিয়ে বসানো হ'লো সেখানে, বিনয় একেবারে বিয়ের পিঁড়িতেই চ'লে এলো। পুরুৎ বললেন, 'আর এক মিনিটও সময় নেই দেরি করবার।' কান্নায় উদ্বেল অনসূয়ার মা'কে অনসূয়ার কাকিমাই ঠেলে-ঠুলে নিয়ে এলেন জামাই বরণ করাতে। এটা তাঁদের প্রাদেশিক নিয়ম। পুরোনো, পোকায়-কাটা, জিরজিরে, পাড়-মুছে-যাওয়া কবেকার একখানা গরদের শাড়ি প'রে ধীরে-ধীরে এলেন তিনি। রোগা মুখে ছুটি নিবন্ত নিরুৎসুক চোখ মেলে তাকালেন জামাইয়ের দিকে, তাকিয়েই

রইলেন। অনস্থয়ার কাকিমা তাঁর হাতে পাটপাতা দিলেন, ধান-দুর্বো দিলেন, মৃদু হাতে ঠেলা দিয়ে সচকিত করলেন। আস্তে সজল হ'য়ে এলো তাঁর দৃষ্টি, গাল বেয়ে সেই জল গড়িয়ে পড়লো বুকের আঁচলে।

বিনয় অবাক হ'য়ে গেল। এই সেই দীর্ঘাঙ্গী, গৌরাঙ্গী, স্মিতশ্রী অনস্থয়ার মা? এই হ'য়ে গেছেন তিনি? এই তাঁর চেহারা? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো সে। অতি কষ্টে একখানা থরোথরো হাত তিনি তুলে দিলেন বিনয়ের মাথায়, অস্ফুটে ডাকলেন, 'বাবা!'

* * *

অনস্থয়াকে নিয়ে এলো তার ছোটো ভাই মণ্টু। শাড়ির আঁচলে আপাদমস্তক নিজেকে জড়িয়ে কাঠের পুতুলের মতো ভারি-ভারি পা ফেলে বিয়ের পিঁড়িতে বিনয়ের মুখোমুখি বসলো সে। হিরণ-মাসিমা ফিশফাশ করলেন, 'একেবারে সাহেবের মতো জামাই!' হালে-চালে চেহারায় হাঁ হ'য়ে গেছে সব টিনের চালের বাসিন্দেরা। বাচ্চারা টুঁ শব্দ করছে না তাদের অন্নুদির বিয়েতে। পুরুৎ মন্ত্র পড়ালেন, নিঃশব্দে তার পুনরুচ্চারণ করলো বিনয়। অবিনাশবাবু নিজেই উৎসর্গ করলেন মেয়েকে। জামাইয়ের সাগ্রহে প্রসারিত হাতের পাতায় সর্বান্তঃকরণে তুলে দিলেন মেয়ের নিষ্কম্প, শীর্ণ, হাড়ের মতো শাদা ঠাণ্ডা একখানা অবিচলিত হাত। স্বস্তিবচন পাঠ হ'লো।

ঈশ, কী ঠাণ্ডা! নিজের হাতের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলো বিনয়ের। কিন্তু মানুষটার দেহে কি প্রাণ আছে? সন্দেহ হয় তার। নাক পর্যন্ত ঘোমটায় ঢাকা, চোখের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ, থুতনি বুকের সঙ্গে ঠেকানো। যতক্ষণ ধ'রে বিয়ে হ'লো এক তিল বদল হ'লো না এই

ভঙ্গির, একবারের জন্য একটু নড়লো না, একটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দন পর্যন্ত বোঝা গেল না বাইরে থেকে। শুভদৃষ্টির সময় ভাইয়েরা ঘোমটা তুলে দিলো, গ্যাসের উজ্জ্বল নীলচে আলোয় দুটি মুদ্রিত চোখ, আর চন্দন-আঁকা ক্লান্ত করুণ মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে ব্যথায় ভ'রে উঠলো বিনয়ের মন।

দুই

বিয়েকে বিলম্বিত করবার মতো কেউ ছিলো না সেখানে। অত্যন্ত সংক্ষেপে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অনুষ্ঠানের সমস্ত পাট চুকিয়ে ঘরে এলো বর-বধূ। অবিনাশবাবু বরযাত্রীদের তদারক করতে-করতে একবার থমকে দাঁড়ালেন, তাকিয়ে দেখলেন আঁচলে আঁচল বাঁধা জামাই-মেয়েকে। অনসূয়ার মা ঘরে-ঘরে গিয়ে সনির্বন্ধ হ'য়ে ডেকে নিয়ে এলেন সকলকে। একটু মিষ্টিমুখ না-করালে কি চলে? বাড়ি না-হয় আলাদা, মাথার উপরকার চালটা তো একই। এলো সবাই, মায়েরা তাদের ঘুমন্ত বাচ্চাদের পর্যন্ত তুলে আনলো। এমন সুদিন আর কবে হবে? কবে ওরা আবার পেট ভ'রে খেতে পাবে অমন সব লোভনীয় সুখাদ্য। মিষ্টির গন্ধে মাংসের গন্ধে ম-ম করছে আজ সারাবাড়ি, শুধু বাচ্চাদেরই কি মুচড়ে-মুচড়ে উঠছে পেট, কেবল কি লুব্ধ কুকুর-বেড়ালই ঘুরঘুর করেছে বাড়ির আনাচে-কানাচে? যাদের এ-বেলা জোটে তো ও-বেলা ঢোঁকে-ঢোঁকে জল খেয়ে নিবারণ করতে হয় পেটের আগুন, তাদের মনও কি একটু কেমন-কেমন করেনি? হাসিতে-খুশিতে, আহ্লাদে-আমোদে সকলের সুখ এক সুখ হ'য়ে গেল মুহূর্তে। সারা বাড়ি এক বাড়ি হ'লো। অতগুলো স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কলরবে মুখর হ'য়ে উঠলো রাত দশটায় সালকের নীরব পাড়া। থৈ-থৈ করতে লাগলো বাড়ি-ঘর। কে বলবে এটাই কুসুমপুর নয়, কুসুমপুরের আত্মীয়বহুল পরিবারের মিলিত উৎসব নয় চৌধুরী-বাড়িতে। আজ কত বছর ধ'রে অনসূয়ার মা বিছানার সঙ্গেই আত্মীয়তা করেছেন সবচেয়ে বেশি। আজ চঞ্চল

পায়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন বড়ো-বড়ো গামলা নিয়ে, হাঁড়ি নিয়ে, ছেলেরা বাধা দিতে এলে ধমকে দিলেন তাদের। ঘোমটা টেনে আলাপ করলেন বরযাত্রীদের সঙ্গে, যথাযোগ্য সম্মান করতে পারলেন না-ব'লে সবিনয়ে মার্জনা ভিক্ষা করলেন বার-বার।

তারপর রাত ভারি হ'লো, একে-একে বিদায় নিলো অতিথিরা, মণ্টু বাবলু গা ধুতে গেল রাস্তার কলে, অনসূয়ার মা-ও দেওর-জাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এলেন। এই ঘরেই শুতে হবে আজ, অবিনাশবাবু উপরে, আর তিনি একফালি মেঝেতেই কোনো-রকমে দরজার কাছে মাদুর পেতে। ছেলেরা অন্য ভাড়াটের ঘরে। একটাই তো রাত। অবিনাশবাবু তার আগেই এসে বসেছেন চৌকিতে, নির্জন ঘরে, এতক্ষণে চোখোচোখি হ'লো স্বামী-স্ত্রীর। চোখোচোখি নয়, কত কাল পরে কত যুগ পার হ'য়ে যেন দেখা হ'লো। কত বিরহের নদী পেরিয়ে, কত মৃতের স্তূপে পা রেখে-রেখে, কত অগ্নিকুণ্ড ডিঙিয়ে— তবে আবার মিলিত হলেন তাঁরা। মহাসমুদ্রে সাঁতার কেটে-কেটে যেন প্রথম মাটির স্পর্শ-সুখ। মরা কাঠ জ্ব'লে উঠলো দপ ক'রে কোনো দাহিকাশক্তি সংঘর্ষণে। দুটি চোখ দুটি চোখের উপর নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলো, চারটি চোখের জলে পৃথিবীর সব দুঃখ ধুয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

'এই বিনয়?' যেতে-যেতে প্রশ্ন করলো বিকাশের স্ত্রী। 'হুঁ,' রাস্তার দিকে মুখ-ফেরানো অন্যমনস্ক বিকাশ জবাব দিলো। আবার চুপচাপ। ট্র্যামের তারগুলো কাঁপছে, হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ। বিষ্টি-ফিষ্টি

নামবে নাকি? ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠলো একটা নেড়ি কুকুর, হুশ-হুশ বাস্ চ'লে গেল ছুটো, শেষ বাস্। ঈশ! কী ভিড়। ভাগ্যিশ এতো রাত্তিরে আবার বাসের জন্যে, ট্র্যামের জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হয়নি। গাড়িটা চমৎকার। যাবার সময় বরযাত্রীরা রেখে গেছে বিনয়ের জন্য, যদি-বা দরকার হয়। বিনয়েরই নির্দেশ। দরকার অবিশ্যি তাঁর আজ হবে না এই রাত্রে, কিন্তু অনসূয়াদের তো কাজে লাগতে পারে? তাঁর কাজ আর অনসূয়ার কাজ দুটো তো আজ একই কাজ।

'অনেক দুঃখ পেয়েছে মেয়েটা, আহা সুখী হোক।' অনেক পরে সনিশ্বাসে ব'লে উঠলেন অনসূয়ার কাকিমা। সুখী হোক! হঠাৎ অন্তরের কোন গভীর তলা থেকে বিকাশের মনেও আজ উঠে এলো এই কথাটি। কেন এলো? কী জানি। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দূর-দূর লম্বা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে মনটা কেন জানি ভারি হ'য়ে উঠলো, ছোট্ট একমুঠো সিল্কের মতো নরম শান্ত স্ত্রীর দিকে তাকালো সে ভালো ক'রে। আজ বিশ-পঁচিশ বছর একসঙ্গে ঘর ক'রে কতটুকু ভালোবেসেছে সে এই মানুষটাকে? বিশ্লেষণ করলো মনে-মনে। কাকে ভালোবেসেছে? দাদাকে? বৌদিকে? সন্তানদের? কাকে? কিছুই মনে করতে পারলো না। চিরকালের শুকনো খটখটে অসাড় হৃদয়ে যেন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে একটা। এ তার কী হ'লো, এ তার কিসের বেদনা? বিনয়কেই বারে-বারে মনে পড়লো, আর মনে হ'লো সব-কিছুরই সীমা আছে, কেবল ওর ভালোবাসারই কোনো সীমা নেই।

সুখী হোক। সুখী হোক। অস্ফুটে উচ্চারণ করলো আবার। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।

*　　　*　　　*

'মণ্টু ঘুমুলি?' যে-ঘরে বরযাত্রীরা বসেছিলো সেই ঘরেরই এক কোণে, এক বিছানায় শুয়ে, এক বালিশে মাথা রেখে উসখুস করতে-করতে বাবলু ঠেলা দিলো ছোটো ভাইকে। মণ্টু জবাব দিলো— 'না।'

'কেন ঘুমুসনি?'

'তুমি কেন ঘুমোওনি?'

'আমি? আমি একটা কথা ভাবছি।'

'কী কথা?'

'না, থাক, তোকে আর সে-সব বলা যায় না।'

একটু চুপ ক'রে থেকে মণ্টু বললো, 'যায় না বুঝি?'

'না।'

'আমিও একটা কথা ভাবছি।'

'কী কথা রে?'

'তুমি যা ভাবছো।'

'তা হ'লে তুই জানিস?'

'কী জানি?'

'সে-সব ঘটনা?'

'কেন জানবো না?'

'তবে চিনতে পেরেছিস?'

'চিনতে আবার পারবো কেমন ক'রে? বুঝতে পেরেছি।'

'ঐ একই কথা।'

একটু চুপচাপ।

'কী সুন্দর, না?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো'ও খুব, না?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক আগে, যখন আমি জানতে পেরেছিলাম এই সব কথা, তখন মনে-মনে কী প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জানিস?'

'কী?'

'বড়ো হ'য়েই তাঁকে খুঁজে বার করবো, আমি জানতাম তাঁর কোনো দোষ ছিলো না, সব দোষ কাকার।'

'হুঁ।'

'কী হয়েছে তোর? ভালো ক'রে কথা বলছিস না কেন?' ভাইয়ের উদাসীনতা এতক্ষণে লক্ষ্য করলো বাবলু। সহসা অন্ধকার হাৎড়ে ওর মুখের উপর হাত বুলোতে চেষ্টা ক'রে বললো, 'তুই কাঁদছিস?'

মণ্টু বালিশে মুখ গুঁজলো।

'কী বোকা!' কানের পাশ দিয়ে বাবলুরও গরম জলের ধারা ব'য়ে গেল, চুল ভিজলো, তবু ভাইকে সান্ত্বনা দিলো সে— 'কালকে আমরা দিদিকে যেতে দিচ্ছি নাকি? খেপেছিস তুই? এখন আর ভয় কী? দেখিস না আমিই কাল আটকে দিই সব কেমন ক'রে। আর তা

নয়তো আমরা দু'ভাই দিদির সঙ্গে গিয়ে বেশ ঘুরে আসবো বোম্বেতে।'

মণ্টুর মন তবু প্রবোধ মানলো না।

*　　　　*　　　　*

ঘর নির্জন হ'তেই বিনয় উঠে গিয়ে আলো নিবিয়ে দিলো, দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়ালো এসে সেই ছোট্ট সরু শিক-দেওয়া জানলার কাছে। পাখিরা পাখা ঝাপটালো বকুলগাছের ডাল-পাতা কাঁপিয়ে, একটা কিচির-মিচির উঠলো রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা ক'রে—আবার সব চুপ হ'লো। এক কোণে কুলোর উপর জলতে লাগলো রঙিন সরা-ঢাকা মঙ্গল-প্রদীপ, তার ছায়া ফেলা-ফেলা আলোর চক্র কেঁপে-কেঁপে ঘরের আবহাওয়াকে অদ্ভুত থমথমানিতে রূপান্তরিত করলো। এই ঘর? এই বাড়ি? এই বস্তিতে বাস করছে অনসূয়া? কী আশ্চর্য! রূপকথা কি এর চেয়েও আজগুবি? জিনিসে-ঠাসা ঐ একফোঁটা দমবন্ধ টিনের ঘরের গরমে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো বিনয়ের। চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটার পর একটা সিগারেট ধরালো, একটার পর একটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়।

এ-রাস্তায় ট্র্যাম নেই, বাস্ নেই, মোটর নেই, শুধু রিকশার টুংটাং। রাত্রি সহজেই স্তব্ধ হ'য়ে আসে এই গলিতে। অনসূয়া বোবা চোখে নিজের পায়ের পাতার বুড়ো আঙুলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'সে রইলো চুপচাপ। তারপর কী ভেবে এক-সময় পা মুড়ে, আঁচলে মুখ ঢেকে বিছানার এইটুকু কোণ জুড়ে শুয়ে পড়লো। বিনয় এলো তার অনেক পরে। হাত থেকে ঘড়িটা খুলে কোথায় রাখবে ভাবতে না পেরে কুলোর উপরই রেখে দিলো, খসখসে সিল্কের পাঞ্জাবিটা লটকে দিলো

আলনার ব্র্যাকেটে। অনস্যুয়ার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো একটু। খানিকক্ষণ যেন নিশ্বাস পড়লো না তার। একটু সময়ের জন্য অন্য কোনো একদিনের এমনিই আবছা-আলো-ফেলা ঘরের এই রকমই একটি যুগল-শয্যার স্মৃতি ঠিক এই রকমই একটা মৃদুমধুর সৌরভে যেন তাকে আচ্ছন্ন করলো। স্পষ্ট অনুভব করলো এই রাতটিই আবার সে ফিরে পেতে চেয়েছিলো জীবনে, এই রাতটির সাধনাতেই এতদিনেও সে অকৃতদার। সহসা সেই চব্বিশ বছরের হৃৎপিণ্ডটা চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় বুকের মধ্যে ধ্বকধ্বক ক'রে উঠলো; অত্যন্ত আস্তে, অতি সন্তর্পণে একখানা হাত সে অনস্যুয়ার ঘোমটা-ঢাকা মাথায় ছুঁইয়ে মৃদু গলায় ডাকলো, 'ঘুমিয়েছো?'

সচকিত হ'য়ে উঠে বসলো অনস্যুয়া। যেন ভয় পেয়েছে, যেন না-জেনে সাপের মাথায় পা দিয়ে ফেলেছে এমনি সতর্ক দ্রুত ভঙ্গিতে স'রে গেল সে তক্তাপোশের পায়ের কাছে, সম্পূর্ণ উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথার কাপড়টা আরো খানিক টেনে দিলো। মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সংযত হ'য়ে পরিষ্কার গলায় বললো, 'না।' ঝোলানো পাঞ্জাবিটার ছায়া পড়েছে দেয়ালে, ভূতুড়ে ছায়া, মস্ত শরীরে স্কন্ধকাটা গোল মাথা, মস্ত-মস্ত ঝোলানো দুটো লম্বা হাতের কঙ্কাল। অনস্যুয়ার চোখ সেখানেই স্থির হ'লো।

লালে সোনালিতে ঝিলমিল জালের মতো পাৎলা সস্তা ক্রেপ বেনারসির স্বচ্ছ আবরণের ভেতর দিয়ে প্রদীপের ঝাপসা অস্পষ্ট আলোয় তার নমনীয় ঘাড়, রুপোর-কাঁটা-গোঁজা মস্ত খোঁপা, আর শ্বেতপাথরের মতো শাদা দুটি কান, আর কানের পাশের একছিটে মুখের আভাসে চোখ রেখে বিনয় বললো, 'আমার উপর কি রাগ ক'রে আছো তুমি?'

'রাগ? ছি!'

'তবে ?'

তবে কী ভেবে পেলো না অনসূয়া। আর রাগই বা সে করবে কেন ? কার উপরে ? এই দয়ার্দ্রচিত্ত ভদ্রলোকটির উপরে কি রাগের কোনো প্রশ্ন ওঠে। তবে কি তার ব্যবহার ভালো হচ্ছে না ? 'আপনার কত দয়া !' কৃতজ্ঞচিত্ত অনুগত জনের গলা ফুটে উঠলো তার কথায়। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো একটু, কিন্তু চোখ আটকে রইলো সেই দেয়ালে। একটু-একটু কাঁপছে সেই ছায়া, একটু-একটু হাত নাড়ছে, প্রদীপের শিখ একবার বাড়ছে একবার কমছে। বাইরে হাওয়া দিলো জোরে।

'দয়া ! দয়া বলছো কেন ? আমি কি দয়া করতে এসেছি তোমাকে ?'

'তা নয় তো কী ? আমি কি দয়ার পাত্র ছাড়া আর-কিছু ?'

'দয়া নয়, দয়া নয়। তাকিয়ে ত্থাখো তুমি, তুমি মুখ ফিরিয়ে ত্থাখো, আমার মুখে কেবল দয়াই লেখা আছে কিনা। অনসূয়া !' প্রায় ফিসফিসিয়ে ডেকে উঠলো বিনয়।

অনসূয়া থমকে গেল। বুকের মধ্যে রক্ত যেন ছলাৎ ক'রে উঠলো সেই ডাক শুনে। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয় একাগ্র হ'য়ে উঠলো আবার ডাকটির জন্ম। সব পুরুষের গলাই কি তবে একরকম ? না কি তারই মনের বিকার ? এত নির্যাতনের পরেও এই বিকার তাকে ছাড়লো না ? ছাড়াতে পারলো না সে ? নয়তো সুদীর্ঘ ষোলো বছরের পলিমাটি ভেদ ক'রে আবার তার বোবা শ্রবণ হঠাৎ এমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো কেন ? কেন এমন অধীর হ'লো ? আজকের দিনেই— যেদিন তার জীবনের এমন একটা চরম শুভদিন। এই শুভদিনটিতে আজ আবার কেন মন অবাধ্য হ'য়ে ওঠে বারে-বারে ?

কেন? কেন? কেন? চোখ বুজে বুকের উপর হাত দুটো সে মুঠো করলো।

তক্তাপোশের এই পাশে স'রে বসলো বিনয়, বালিশের উপর একটু এলিয়ে বললো, 'আমাকে তুমি আপনি বলো কেন?'

'আপনি আমার গুরুজন।'

'গুরুজন! পতি পরম গুরু?'

অনসূয়া চুপ ক'রে রইলো।

'এদিকে ফিরে বোসো না। তুমি কি আমার মুখ দেখবে না?'

'আমি— আমি—' তেমনিই মুখ ফিরিয়ে রইলো অনসূয়া।

'শোনো।'

'বলুন।'

'শুনেছো নিশ্চয়ই আমি আবার কালই এখান থেকে ফিরে যাবো বোম্বেতে।' বিনয়ের নিচু গলা এবার গম্ভীর।

'শুনেছি।'

'তোমার কী ইচ্ছে?'

'আমার—'

'তুমি কী করবে?'

'আমি? আমি কী করবো?'

'নিশ্চয়ই যাবে না?'

'অনুমতি করলে যাবো।'

'আর না-করলে?'

'এখানেই থাকবো।'

'কোথায় থাকবে?'

'এখানেই, এ-বাড়িতেই।'

'এ-বাড়িতেই?' হাসলো বিনয়, 'এ-বাড়িতে যে আর তোমার জায়গা হচ্ছে না তা কি তুমি বোঝোনি? নইলে নাম জানে না, ধাম জানে না এমন একটা প্রবাসীর হাতে কোনো মানুষ তার মেয়েকে সমর্পণ করে?'

ঠিকই তো। এর আর জবাব কী?

'তবে অবিশ্যি একটা কাজ করতে পারো।' বিনয়ের গলায় দস্তুর-মতো রাগের আভাস। 'এখানে আমি যে-বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি সেটা রেখে যেতে পারি তোমার জন্যে। তুমি থাকবে, ইচ্ছে করলে এবং সম্মানে না-আটকালে তোমার মা-বাবাও থাকতে পারেন তোমার সঙ্গে। আর না-থাকলে অন্য লোকজন রেখে সব ব্যবস্থা ক'রে যাবো।'

অনসূয়া ভেবে উঠতে পারলো না স্বামীকে তার কী জবাব দেওয়া উচিত। কেমন ক'রে তাঁর স্বামীত্বের অধিকারে আত্মসমর্পণ করা উচিত? কেন? কেন পারে না, কেন পারছে না? কী সেই বাধা! কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে এমন ক'রে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে? মানুষটি ভদ্র, আরো ভদ্র তাঁর উচ্চারণ, তাঁর কণ্ঠস্বর, আর— আর তাঁর কথা বলবার বিশেষ ভঙ্গিটি। কান উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে, শুনতে-শুনতে কেবল ভুল হয়, কেবল মন-কেমন করে। অস্থির হ'য়ে উঠলো সে। তার বুক-পিঠ বেয়ে ঘাম নামলো পিঁপড়ের সারের মতো, বিন্দু-বিন্দু ঘামে কপালের চন্দন মুছে গেল।

সে কী চেয়েছিলো? এই তো! শুধু তো এই। যে-কোনো, যে-কোনো একজন মানুষকে অবলম্বন ক'রে এ-জীবন থেকে মুক্তি পেতে— এই তো সে চেয়েছিলো? এই তো ছিলো তার দিনরাত্রির প্রার্থনা।

কিন্তু ঈশ্বর যেদিন পূর্ণ করলেন সেই প্রার্থনা, সেদিন কেন এমন হ'লো মন ? কেন এমন হ'লো ? শক্তি দাও, প্রভু, মনে শক্তি দাও।

'আমি আপনার সঙ্গেই যাবো।' হঠাৎ যেন মৃত্যুর পরপার থেকে কথা ব'লে উঠলো অনসূয়া।

'এত দয়া না-ই বা করলে।' আধখানা ফেরানো পিঠের উপর বিদ্রূপ ছুঁড়ে মারলো বিনয়— 'দয়াময়ী।'

বুক কেঁপে উঠলো অনসূয়ার— 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার রাগের যোগ্য নই।'

'অনু, অনসূয়া।' কেমন ব্যথিত, আর্ত গলায় ডেকে উঠলো বিনয়, 'তুমি এই, এই হ'য়ে গেছো ? তুমি এখনো এত নিষ্ঠুর ? এত হৃদয়হীন ?'

কে ? কে ?

আর থাকতে পারলো না অনসূয়া, মুহূর্তে ঘুরে ব'সে চোখ তুলে তাকালো সে বিনয়ের মুখের দিকে। চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে একটু হাসলো বিনয়। ভারি গলায় বললো, 'আবার আমার ভুল হ'লো, অনসূয়া। আমি জানতাম না এতদিনে কতটা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছি তোমার হৃদয় থেকে।'

অনসূয়া স্তব্ধ।

'অস্বাভাবিক নয়। কালের প্রভাব কোনো মানুষই এড়াতে পারে না, বরং আমার ব্যবহারটাই হয়তো অত্যন্ত খাপছাড়া গোছের হ'য়ে গেল।'

অনসূয়া চুপ।

একটা গুমোট নামলো ঘরে। বিনয় উঠে গিয়ে সিগারেট-কেসটা নিয়ে এলো সেই ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে। এখানে-ওখানে খুঁজলো

পেট্রোল চকমকিটা। গেল কোথায়? যাকগে, সিগারেটটা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঐ কোণে। হাসলো একটু। 'আমার ইচ্ছে করছে কী জানো, এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের লজ্জা ঢাকি। কত অপমান, অসম্মানই তো জীবন ভ'রে ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি বোধহয় আর-কিছুই ছিলো না। এ আমার সব চেয়ে বড়ো পরাজয়।'

প্যাঁচা ডাকলো বাইরে। ঝিরঝির ক'রে হাওয়া দিলো, গাছের পাতায়-পাতায় শব্দ উঠলো। ঠাণ্ডা হাওয়া। নিঝুম বুঝে বুঝি গঙ্গা থেকে উঠে এসেছে চুপে-চুপে। শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে শহরের তপ্ত বুকে। টিনের ঘরের গুমোটও কমলো। একখানা পাৎলা টিনের ব্যবধানে পাশের ঘরের কাশি শোনা গেল। সামনের বড়ো দোতলা বাড়িতে টিপ ক'রে একবার জ্ব'লে উঠলো আলো, আবার নিবে গেল তক্ষুনি। অনসূয়া তেমনি স্থির, তেমনি নিষ্পলক।

'কী দেখছো? চিনতে পারোনি?'

চুপ।

'কথা বলছো না কেন? কী হয়েছে?'

একটা পলক তো নয়, একটা যুগ। হঠাৎ অত্যন্ত অস্থির বোধ করলো বিনয়। 'বলো, বলো, একটা-কিছু বলো অনসূয়া। একটা কথা বলো।' অধীর আবেগে অনসূয়ার হাত ধ'রে সজোরে নাড়া দিলো সে। আর নাড়া খেয়েই কেঁপে উঠলো চোখের পাতা, কাঁপলো রংহীন ঠোঁট, প্রাণ ছড়িয়ে পড়লো শরীরে। শীতের শুকনো গাছ থেকে এবার টপটপ ক'রে শিশির ঝ'রে পড়লো অজস্র ধারায়। ভাগ্যের এই অবিশ্রান্ত পরিহাসে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠলো মুখে। দুঃখ-দারিদ্র্য-নিপীড়িত

কুঞ্চিত ফুসফুস থেকে মস্ত একটি নিশ্বাস বেরিয়ে এলো সশব্দে, তারপর শান্ত গলায় অনস্থয়া বললো, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি। আমি শ্রীবিনয়কুমার রায়। নারীহরণ-মামলার সেই দাগি আসামি। চিনতে পেরেছো এতক্ষণে?'

'আমি তো এতক্ষণ দেখিনি।'

'গ্যাখোনি?'

'না।'

'ও।' একটু চুপ। 'আমার গলাও কি শোনোনি?'

'গলা? তোমার গলা?'

'ভুলে গেছ? সব ভুলে গেছ?'

'ভুলে গেছি?'

'তবে? তবে কী?' আকুল বিনয় কাঙালের মতো একখানা হাত মেলে দিলো অনস্থয়ার কোলের উপর, 'অনু, অনেক কষ্টই আমি দিয়েছি তোমাকে, কিন্তু কত কষ্ট যে আমি পেয়েছি তা তো তুমি জানো না।'

'জানি।'

'এবার তুমি আমাকে নাও, আমার ভার নাও তুমি। আমি আর পারি না।'

একসঙ্গে সমস্ত অতীত উতরোল হ'য়ে উঠলো অনস্থয়ার বুকের মধ্যে। আশ্চর্য! এখনো বিনয় তাকে ভালোবাসে? তেমনি ক'রেই ভালোবাসে? এতদিন পরে, এত-কিছুর পরে? আবার ঠিক তেমনি ক'রেই সর্বস্ব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে? কার কাছে? সেই সতেরো বছরের পরিপূর্ণ যৌবন, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য অনস্থয়ার কাছে? সে তো

কবে ম'রে গেছে। এ তো তার কঙ্কাল? ভুল। ভুল। বিনয়, ভুল করেছো তুমি। যার কাছে, যাকে ভেবে আজ তুমি এই উদ্দাম হৃদয় নিয়ে এসে অঞ্জলি পেতেছো, আমি তো সে নই। ছাখো, ছাখো, তাকিয়ে ছাখো; তেত্রিশ বছরের এই বিগতযৌবন জীর্ণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে ছাখো তুমি, তারপর কথা বলো। তোমাকে অনেক ঠকিয়েছি, অনেক দুঃখ দিয়েছি, তোমার সব কষ্ট, সব দুঃখের জন্মই তো এই আমি মানুষটা থেকে। কিন্তু আর না, আর আমি পারি না ঋণী হ'তে। পারি না। পারি না। ঘরের চারদিকে বড়ো-বড়ো উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকালো অনস্য়া, তাকালো বিনয়ের মুখের উপর। সত্যি! সব সত্যি! সত্যিই আবার সেই বিনয়। সেই নিভৃত নির্জন ঘরে আবার তাদের যুগল-জীবনের ভূমিকা। সুস্থ, সুন্দর, আরো সুন্দর, আরো যোগ্য, আরো পরিণত বিনয়। হায়! হায়! এ-মানুষকে দেবার মতো কী সম্বল আর আজ আছে তার? গুরুজনদের আকাশ-ছোঁয়া ঋণশোধ করতে-করতে কি সব ফুরিয়ে যায়নি? সে তো আজ ঠাণ্ডা, সে আজ মৃত। চাঁদের অতল শীতলতা ছাড়া, কই, আর তো কিছুই সে অনুভব করেনি এই ষোলো বছরের মধ্যে। একটা নীরন্ধ্র অন্ধকারে কেবল হাবুডুবু খেয়েছে, দু'হাতে কেবল প্রাণপণে লগি ঠেলেছে এই দীর্ঘায়ুর সীমাহীন দম-আটকানো কঠিন রাস্তা পার হবার জন্ম। কই? আশা কই? আলো কই? এই দীর্ঘ পথ হাঁটতে-হাঁটতে কত ফুল ঝ'রে গেল, কত গন্ধ বিলীন হ'লো, ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে-হ'য়ে কত রক্ত ঝরলো হৃদয় থেকে, ক্ষণিক জীবনের ক্ষণিকতম বসন্ত উজাড় হ'য়ে গেল এই মৃত্যুর মতো কঠিন হিম-শীতল অন্ধকারের পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে। তারপর আর বাকি রইলো কী?

কী রইলো আশা করবার, আকাঙ্ক্ষা করবার, উদ্দাম আগ্রহে কুড়িয়ে নেবার?

বুকের ভেতর ব্যথা ক'রে উঠলো। ষোলো বছর ধ'রে একদিনের জন্যেও যাকে ভুলে থাকতে পারেনি, যার কথা ভেবে নিজেকে সে ছিঁড়েছে, খুঁড়েছে, টুকরো-টুকরো ক'রে কেটেছে, যার স্মৃতিকে এতটুকু ফিকে হ'তে দেয়নি পাছে সেই ভুলের রাস্তা বেয়ে আবার উঠে আসে কোনো সুখ, কোনো শান্তি, কোনো মধুরতা যদি ফিরে আসে জীবনে, সেই মানুষ যখন সত্যি এলো তখন কেন এমন দেউলে হ'য়ে গেল তার হৃদয়? ষোলো বছরের সব দুঃখ জমা করলেও বুঝি আজকের এই দুঃখের তুলনা হয় না। যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠলো সে।

'অনসূয়া! অনু!' নিবিড় হ'য়ে কাছে এলো বিনয়, অনসূয়ার নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো প্রসারিত স্থির চোখের পাতায়, মুখে, কপালে আস্তে হাত বুলোলো। 'আজ আমার ঠিক তেমনি লাগছে, তেমনিই মনে হচ্ছে সব। মাঝখানকার সময়টা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। তুমি তো ঠিক তেমনি আছো।'

'আছি!'

'আবার আমি তোমাকে নিয়ে যাবো আমার কাছে, আমার ঘরে। আবার আমাদের নতুন জীবন, নতুন সুখ। আবার তোমার-আমার ছোট্ট সংসার—'

'আবার!' যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো অনসূয়া। যেন ফেটে গেল বুকটা। আবার সে সংসার পাতবে নতুন ক'রে? আবার কচিপাতায় ছেয়ে যাবে মরা ডাল? আসবে কুঁড়ি, ফুটবে ফুল। আবার সব হবে? হবে? আবার সেই বিনয় আর অনসূয়া। অনসূয়া আর বিনয়। তুমি আর আমি।

সহসা সতেরো বছরের ঘুমোনো বসন্ত যেন লাফিয়ে উঠে এলো, সতেরোটি ফাল্গুন শিরশির ক'রে উঠলো সারা শরীরে। এ-গৌরব সে আজ রাখবে কোথায়? এই জয়? এই অহংকার? নিথর সমাধি থেকে ভাপসা গন্ধ ঠেলে সতেরো বছরের উদ্দাম যৌবন টগবগিয়ে উঠলো রক্তের মধ্যে। আছে, আছে, সব আছে। সব। সব। তিল-তিল ক'রে সবটুকু আমি সঞ্চয় ক'রে রেখেছি এতদিন তোমার জন্য। সে যে কত, কতখানি, তার পরিমাণ কি কেউ জানে? এই তো, এই জন্যেই তো। এই আশাতেই তো।

'ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।' উত্তাল হ'য়ে সে কুড়িয়ে নিলো বিনয়ের হাত দুটি, সেই বলিষ্ঠ হাতের পাতায় মুখ ঢেকে সেই উত্তপ্ত প্রেমের স্রোতে গলিয়ে দিলো তার এতদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ-বেদনার শক্ত পাষাণ। পাথর ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। নিজেকে সে পিষে ফেললো, মিশিয়ে দিতে চাইলো বুকভাঙা মর্মান্তিক কান্নায় বিনয়ের বুকের উপর ভেঙে প'ড়ে। বিনয় ব্যাকুল হাতের আলিঙ্গনে জড়িয়ে নিলো তাকে, তার স্ত্রীকে। কান্নাকাঁপা, ভাঙাথোপা, কোমল নরম আনত পিঠের বাঁকা রেখার দিকে তাকিয়ে গভীর ভালোবাসায় বুক ভারি হ'য়ে উঠলো। এই নাকি তার সেই ছোট্ট সবুজ কচি চারা গাছ? জলে ঝড়ে রোদে তাপে সে এমন ক'রে ভ'রে উঠেছে ফুলে ফলে? এমন সজল হ'য়ে? সতেরো বছরের অপেক্ষা তবে কি তারই প্রস্তুতি? এইমাত্র সে উপলব্ধি করলো যৌবন-দীপ্ত সেই অনসূয়ার চাইতে আজকের এই রোগা ছোট্ট তেত্রিশ বছরের দুঃখ-পাওয়া অনসূয়া অনেক বেশি নিটোল, অনেক সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণতম।